মে ২০২৬ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

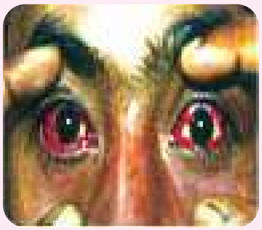
হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

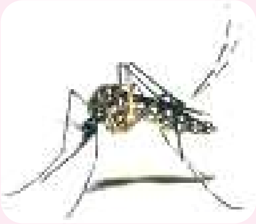
এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২৬ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে ৩রা মে ২০২৬ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত চার দিনব্যাপী জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে জেলাপ্রশাসকগণ ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মো. ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
৮৩০০৬৮৭
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের সেই আত্মত্যাগ শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজও সকল শ্রমজীবী মানুষদের প্রেরণা ও শক্তি জোগায়। এবছর মে দিবসের ১৪০তম বার্ষিকী বিশ্ব উদ্‌যাপন করছে। সারাবিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৬'। মে দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত, আসবে এবার নব প্রভাত'। শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমেই গড়ে ওঠে শিল্প, কৃষি অবকাঠামো ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি। তাই তাদের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানতম অঙ্গীকার। মহান মে দিবস নিয়ে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

ঈদুল আজহা মুসলমানদের আত্মত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের এক মহান উৎসব। এই ত্যাগের উৎসবটি শুধু পশু কুরবানি নয়, বরং মনের ভেতরের পশুবৃত্তিকে ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানুষের মাঝে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি বার্তা বহন করে। এটি সমাজে সাম্য, মৈত্রী এবং সহমর্মিতার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ এ মাসে পালন করা হয়। এ সংখ্যায় পবিত্র হজ ও ঈদুল আজহা নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪৩৩। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর স্মরণে নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩। শানিত লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হন তিনি। তাঁর স্মরণে রয়েছে নিবন্ধ।

মা– ছোট্ট একটি শব্দ, অথচ এর ভেতরেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সবেচেয়ে গভীর ভালোবাসা, নিরাপত্তা আর নিঃস্বার্থ ত্যাগের গল্প। সন্তানের হাসির জন্য স্বপ্ন বিসর্জন দেওয়া মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতেই প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বজুড়ে পালিত হয় মা দিবস। এই মমতাময়ী মায়েদেরকে উৎসর্গ করে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

প্রতিবছর ৩রা মে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস। বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে রয়েছে সচিত্র প্রতিবেদন।

এছাড়াও বিশেষ দিবস, ভ্রমণকাহিনি, গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন রয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যায়। আশা করি, এ সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/গ্রন্থ পর্যালোচনা/ভ্রমণকাহিনি

মহান মে দিবস: বন্ধ কারখানা চালু করার প্রত্যয় ৪
হাসান হাফিজ

হজকোষ ও হজের পরিভাষা ৭
ড. মোহাম্মদ হাননান

প্রকৃতি, দ্বৈততা ও তাওবাদ ৯
ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্য ১২
কমল চৌধুরী

ডিজিটাল নাগরিকত্ব: স্ক্রিনের নৈতিক দায় ১৫
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ১৮

প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রযাত্রা ২১
মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন

কাজী নজরুল: জনতার সরণি থেকে মধ্যবিত্তের প্রেম-দ্রোহ-উচ্ছলতায় ২৩
আবদুল্লাহ আল-আমিন

দুই বাংলায় দুই রবীন্দ্রনাথের সুলুক সন্ধান ২৯
ড. কুদরত-ই-হুদা

উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ: সময় এখনই ৩৪
অদিতি রিতু

তামাকের করালগ্রাসে জনস্বাস্থ্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৩৭
খোন্দকার মাহ্ফুজুল হক

থ্যালাসেমিয়া ৪১
ডা. দীপান্বিতা মণ্ডল

***নদী ও নারী* এবং হুমায়ুন কবীর** ৪৪
আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

মুন্সিগঞ্জে সারাটা দিন ৪৭
চান্দ্রেয়ী পাল মম

নিরাপদ মাতৃত্ব সকল নারীর অধিকার ৫০
জান্নাতুল ফেরদৌস

ভালোবাসার অপর নাম ‘মা’ ৫২
আফফান হোসেন

গল্প

কাঁটা ও কাঁটা ৫৪
মনি হায়দার

শেষ ট্রেনের অপেক্ষা ৬১
মামুন সরকার

কবিতা

৫৮-৬০
বাবুল তালুকদার, রুস্তম আলী, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, লিলি হক, মোহাম্মদ শরীফ, সুজিত হালদার, ওয়াসীম হক, আদিবা আবসারী, বিচিত্র কুমার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সংগীত শিল্পী ডালিয়া নওশীন ৬৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ১লা মে ২০২৬ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৬' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মহান মে দিবস

বন্ধ কারখানা চালু করার প্রত্যয়

হাসান হাফিজ

মহান মে দিবসকে বলা হয় মেহনতি মানুষের বিজয়ের দিন, আনন্দ ও সংহতি প্রকাশের দিন এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অনুপ্রেরণার দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক আট ঘণ্টা কর্মসময় ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিবছর দিবসটিকে 'মে দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই থেকে সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষ বিশেষ মর্যাদায় দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশেও শ্রমিক সংগঠনগুলো যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করে। এ বছরও একইভাবে দিবসটি পালন করা হয়েছে। মে দিবস পালনের শতাধিক বছরের ইতিহাসে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনকে অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হয়। আমরা জানি, উন্নত অনেক দেশেই আজ শ্রমিক স্বার্থের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে আইএলও কনভেনশনসহ শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে স্বীকৃত অনেক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

১৮৮৯ সালে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণার পরের বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মে দিবসে শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ হয়। প্রখ্যাত প্রতিবাদী সংগীত তারকা পিট সিগার 'টকিং ইউনিয়ন' গানের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। শ্রমিকদের দাবির কথা বলেছেন যারা, তারাই কঠোর দমননীতির শিকার হন। এমনই একজনের নাম জো হিল। অভিবাসী শ্রমিক ও সংগীত রচয়িতা জো হিলকে হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ১৯১৫ সালে। 'জো হিল' নামে রচিত হয় বিখ্যাত গান, যা অমরত্বের দাবিদার। জননন্দিত এই গানটিতে কণ্ঠ দেন কিংবদন্তি সংগীত তারকা জোয়ান বায়েজ।

১৮৮৯ সালে জিম কোন্যাল লেখেন রেড ফ্ল্যাগ নামে একটি গান। গানটির প্রথম চরণ হলো– জনতার পতাকা টকটকে লাল/ ঢেকে রাখে শহীদের লাশ/ শক্ত শীতল তাদের দেহ/ এই পতাকার প্রতি ভাঁজে ভাঁজে/ হৃদয়ের রক্ত রাঙায় এই পতাকা। এটি একটি দীর্ঘ সংগীত। ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাই– একইভাবে বব হার্ট, কপল্যান্ড, অ্যাসলেট প্যাটিশ মে দিবস ও শ্রমিকের অধিকার নিয়ে গান লিখেছেন। মে দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলা গান ও কবিতা হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি কবিতা এরকম: প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা, চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য/ কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া। চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,/ গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে, তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য/ জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গাওয়া গান ‘জন হেনরি’ এমন এক গান, যা আমাদের চিন্তা জগৎকে মুহূর্তে নাড়িয়ে দেয়, আলোড়ন তোলে এবং মানুষের মুক্তির চূড়ান্ত পথে চালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। গানটির কথা হলো: জন হেনরি, জন হেনরি/ নাম তার ছিল জন হেনরি ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন/ হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিল্পী/ খুশি মনে কাজ করে রাত-দিন/ হো হো হো হো খুশি মনে কাজ করে রাত-দিন।

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১লা মে ২০২৬ ঢাকায় নয়া পল্টনে মহান মে দিবস (আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মহান মে দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে ১লা মে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাণী প্রদান করেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণে যুগান্তকারী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই শহিদ জিয়া নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আরো বলেন, ‘মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক গৌরবোজ্জ্বল দিন।

১৮৮৬ সালের এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের সেই আত্মত্যাগ শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজও আমাদের প্রেরণা ও শক্তি জোগায়। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার শ্রম আইন সংস্কার, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের যৌক্তিক মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে পেনশন ব্যবস্থা চালু, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বন্ধ শিল্প চালু, ন্যায্যমূল্যে খাবার সরবরাহ, স্থায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতসহ শ্রমিক সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে নানা কর্মসূচি ও নীতি গ্রহণ করেছে।’

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আরো বলেন, ‘এই দিনে আমি দেশে-বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের সকল শ্রমজীবী-কর্মজীবী ভাইবোন, যারা জীবন-জীবিকার জন্য, সর্বোপরি দেশের উন্নয়নের জন্য কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষই যে-কোনো দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি আর অগ্রযাত্রার প্রধান অবলম্বন। শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমেই গড়ে ওঠে শিল্প, কৃষি, অবকাঠামো ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি। সুতরাং তাদের জীবনমান উন্নয়ন, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানতম অঙ্গীকার। আমি মনে করি, শ্রমবান্ধব নীতি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং কল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব।’

মে দিবসে রাজধানীর নয়াপল্টনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেকে

রহমান বলেন, 'বিগত সরকারের আমলে দেশের শিল্প কারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। অর্থনীতিকে করা হয়েছিল আমদানিনির্ভর। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। বন্ধ কলকারখানাগুলো কত দ্রুত চালু করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে চলতি সপ্তাহেই একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে দেশের সব বন্ধ কলকারখানা চালু করে বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।

সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা জানি শুধু বন্ধ কারখানা চালু করলে সবার কর্মসংস্থান হবে না। আরও লাখ লাখ বেকার যুবক রয়েছেন। তাদের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করছি। শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।' ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হকারদেরও পরিবার আছে, তাদেরও খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে। শুধু উচ্ছেদ করলেই হবে না, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান বা ব্যাবসার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে হকারদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে'।

মহান মে দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর কর্মসূচিতে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি নির্ধারণের দাবি জোরালোভাবে উঠে এসেছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রা, সমাবেশ। আলোচনাসভায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও মজুরি কাঠামো পুনর্বিন্যাসের দাবি প্রাধান্য পায়। শ্রমিক নেতারা বলেন, বর্তমানে মূল্যস্ফীতির চাপে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় ক্রমেই কমে যাচ্ছে, ফলে তাঁদের ন্যূনতম জীবনধারণও কঠিন হয়ে পড়ছে।

রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক সমাবেশ। নেতারা বলেন, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি নির্ধারণ না হলে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। খাদ্য, বাসাভাড়া, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক পরিবারগুলো মারাত্মক চাপের মধ্যে রয়েছে। সমাবেশে উত্থাপিত শ্রমিকদের সাত দফা দাবির অন্যতম ছিল ২০২৬ সালের জন্য 'বাঁচার মতো মজুরি' ঘোষণা। পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহে 'শ্রমিক কার্ড' চালু, শিল্পাঞ্চলে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন বন্ধের দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ২০ লাখের মতো তরুণ কর্মক্ষম হয়। তাদের একটি অংশের কর্মসংস্থান হলেও বাকিরা হয় বেকার থাকে, না হয় অতি সামান্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। কয়েকটি পেশা ছাড়া বাকি পেশাগুলোর শ্রমিকরা এখনো কোনো হিসাবে আসেন না। এর মধ্যে আছে কৃষি, মাছ ধরা, নির্মাণ শিল্প, কুটির শিল্প, গ্রামগঞ্জে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা ছোটোখাটো কারখানা, দোকান, ইটভাটা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে না আছে কোনো নিয়োগপত্র, না আছে কর্মঘণ্টার হিসাবপত্র, না আছে উপযুক্ত মজুরি।

স্বীকৃত পেশাগুলোতেও রয়েছে নানামুখী বঞ্চনা, কথায় কথায় ছাঁটাইয়ের মতো দুর্গতি, এমনকি নিপীড়ন, নির্যাতনের বেদনাদায়ক নজির। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানামুখী চাপের কারণে পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের শ্রম অধিকার ও কর্মপরিবেশের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা এখনো ব্যাপক বঞ্চনার শিকার। অনেক কাজেই পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় তাদের কম মজুরি দেওয়া হয়। নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় অনেক ক্ষেত্রে। গৃহস্থালি কাজে সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক নিয়োজিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে এখনো ন্যূনতম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সংকটের সম্মানজনক একটি সমাধান বহুল প্রত্যাশিত।

শ্রমিকদের বড়ো অংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এ কারণে যেমন তারা নিজেদের সংকট দূর করা ও দাবি আদায়ে সংঘবদ্ধ হতে পারে না, তেমনি সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নয়নে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সর্বজনস্বীকৃত হলেও দেশে আইনি এবং আইন বহির্ভূত নানা বাধার কারণে ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কৃতি খুবই অসংগঠিত ও দুর্বল। দেশের শ্রম খাতের কাঠামোগত সংস্কার না হলে শ্রমিক শ্রেণির ভাগ্যবদল শেষ অবধি দুরাশাই রয়ে যাবে।

আমাদের এটি মনে রাখা জরুরি যে, শ্রমিক শ্রেণিই দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো শক্তি। এই শ্রমিকরাই দেশে-বিদেশে কাজ করে বাংলাদেশের ভাগ্য বদলে বিশাল অবদান রেখে যাচ্ছেন। প্রবাসে বঞ্চনা ও কষ্টের জীবনযাপন করা অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার নিরলস জোগান দিচ্ছেন। দেশের অর্থনীতিতে এই অবদান ব্যাপকভাবে প্রাণসঞ্চার করে চলেছে। আবার দেশের ভেতরে থেকেই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা রপ্তানি আয়ের ৮৬ শতাংশের জোগান দিচ্ছেন। এগুলো না থাকলে অর্থনৈতিক দুর্দশা আরো অনেক বেশি শোচনীয় হয়ে উঠত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা আশা করি, শ্রমিক শ্রেণির বিপুল সমর্থনে নির্বাচিত বর্তমান সরকার দলীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে মূল্য দেবে এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে— সেটাই এই সময়ের দাবি এবং জনপ্রত্যাশা।

হাসান হাফিজ: সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং সম্পাদক, দৈনিক, কালের কণ্ঠ

হজকোষ ও হজের পরিভাষা

ড. মোহাম্মদ হাননান

'কোষ' হলো অভিধান, কিন্তু অভিধানের চেয়ে সামান্য বেশি, ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ অর্থ ও তাৎপর্য মেশানো বই হলো 'কোষ'। পরিভাষা হলো, বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ অথবা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ অথবা পদও।[১]

'হজ' একটি সাধারণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, যা বছরে একবার ঘটে এবং অর্থ ও সামর্থ্যবান মানুষদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তাই হজে ব্যবহৃত শব্দগুলো মানুষের মাঝে কম প্রচলিত এবং কম বোধগম্য। এ পটভূমিতে হজে ব্যবহৃত শব্দসমূহের একটি তালিকা ও তার অর্থ দেখা যেতে পারে।

১. হজ: হজ-এর শাব্দিক অর্থ 'ইচ্ছে করা'। এ অর্থ করেছেন মুফতী শাফী (রহ.), তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থ *মারেফুল কোরআন* গ্রন্থে। হজ মুসলিম সমাজের প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ইব্রাহিম (আ.) কাবাঘর নির্মাণের পর আল্লাহর নির্দেশে মানবজাতির উদ্দেশে প্রথম হজের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাই হজের বিধিবিধান বেশির ভাগই ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) কেন্দ্রিক। সাধারণভাবে হিজরি জিলহজ মাসের নয় তারিখে হজ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজের সামর্থ্যবানরা প্রতিবছর মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজব্রত পালন করেন।

২. ওমরাহ: সাধারণ মুসলমানরা ওমরাহকে 'ছোটো হজ' বলে থাকে। নবী (সা.) বলেছেন, 'যে কেউ রমজানে ওমরাহ করল সে যেন আমার সাথে হজ করল'। এসব নানা দিক থেকে ওমরাহর গুরুত্ব রয়েছে। হজের মীনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামারাত বাদে ওমরাহতে সবকিছুই করতে হয়। এহরাম বাঁধতে হয়, তাওয়াফ এবং সায়ী করতে হয়। হজের সময় বাদে সারা বছরই ওমরাহ পালন করা যায়।

৩. বদলি হজ: একজনের পরিবর্তে আরেক জনের হজ আদায়। ইসলামে হজকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি অর্থসম্পদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শারীরিক বা অন্য কোনো কারণে হজ করতে না পারেন, তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ হজ করে দিতে পারেন। মৃত পরিবারের সদস্যের পক্ষ থেকে সন্তানরা সামর্থ্যবান হলে বদলি হজ করে নিতে পারেন।

৪. এহরাম: হজ বা ওমরাহর নিয়ত করে তালবিয়া পড়া। পুরুষদের এ সময় এহরামের বিশেষ পোশাক পরতে হয়।

৫. মুহরিম: যিনি এহরাম বাঁধেন, তিনিই মুহরিম বলে পরিচিত হন। নিয়ত ও এহরাম দ্বারা হজের কাজ শুরু হয়ে যায়।

৬. তালবিয়া: এই দোয়া পড়া: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ানি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক লা-শারীকা লাক'। হজের সময় সালাম-মুসাফা না করে তালবিয়াই পড়তে হয়।

৭. ইছতিলাম: হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বা হাত দিয়ে ইশারা করে তালুতে চুমু খাওয়া। রুকনে ইয়ামানিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করাকেও ইছতিলাম বলা হয়।

৮. ইযতিবা: পুরুষের জন্য এহরামের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখাকে ইযতিবা বলে। যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সে তাওয়াফ অবস্থায় এটা করণীয়।

৯. রমল: যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্কর কাঁধ 'হেলিয়া দুলিয়া' ছোটো ছোটো পদে একটু দ্রুত ও বীরদর্পে হাঁটা। নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন এভাবে তাওয়াফ করেছিলেন।

১০. সায়ী: তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর সাফা পাহাড় ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

১১. মসজিদে হারাম: কাবাঘর বা বায়তুল্লাহ শরিফকে চারদিক থেকে যে বিশাল মসজিদ ঘিরে রেখেছে এটাই মসজিদে হারাম বা হারাম শরিফ।

১২. মুলতাজাম: হাজরে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরিফের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়াল। অনেকে কাবাঘরের দরজাকেই মুলতাজাম মনে করে। কিন্তু এটা ভুল।

১৩. রুকনে ইয়ামানি: কাবাঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

১৪. হেরেম: মসজিদে হারামের চতুর্দিকে কিছুদূর পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকাকে হেরেম বলা হয়। চারদিকে এর সীমানা চিহ্নিত রয়েছে। এখানে যুদ্ধ করা, পশুপাখি শিকার করা, গাছ কাটা নিষেধ। এখানে কাফেরদের প্রবেশও নিষেধ।

১৫. মিকাত: মক্কাগামী বা হাজিদের জন্য যে স্থান এহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা জায়েজ নয় সেই স্থানকে 'মিকাত' বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ থেকে বিমানের যাত্রীদের জন্য মিকাত 'কারানুল মানাযিল' ও 'যাতু ইর্‌ক'-এর মধ্যবর্তী স্থান। বিমান থেকে এটা চিহ্নিত করতে ঝুঁকি বলে ঢাকা থেকেই হাজিরা এহরাম বেঁধে থাকেন।

১৬. হিল: হেরেমের সীমানার বাইরে মিকাতের আগ পর্যন্ত স্থানকে হিল বলে।

১৭. দম: ওমরাহ ও হজের আমলে বিশেষ ত্রুটি হলে কিংবা এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে হেরেমের এলাকায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি ছাগল বা দুম্বা কিংবা উট-গরুর সাত ভাগের এক ভাগ কোরবানি করাকে দম বলে। আর কোনো কোনো ভুলের কারণে গোটা গরু বা উট জবাই করতে হয়, একে 'বাদানা' বলে।

১৮. তাওয়াফ: হাজরে আসওয়াদের কোণ থেকে শুরু করে পুরো কাবাঘর বিশেষ নিয়মে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

১৯. তাওয়াফে জিয়ারত: এটি হজের ফরজ তাওয়াফ। ১০ জিলহজ সুবহে সাদিক থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের ভেতর এ তাওয়াফ হাজিদের করে নিতে হয়। তা না-হলে হজ হবে না।

২০. উকূফ: উকূফ অর্থ অবস্থান করা। নির্দিষ্ট সময়ে আরাফা ও মুজদালিফায় অবস্থান করাকে 'উকূফ' বলা হয়।

২১. জামারাহ: হাজিগণ মীনার যে তিনটি স্থানে কংকর নিক্ষেপ করেন তার প্রত্যেকটিকে 'জামারাহ' বলে, এর বহুবচন 'জামারাত'। এখানে শয়তানকে ঢিল মেরে ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর কোরবানির কাহিনিকে স্মরণ করা হয়।

২২. তাওয়াফে বিদা: তাওয়াফে জিয়ারতের পর মক্কা থেকে বিদায়ের আগে যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে বিদা বলে। অনেক আলেম একে তাওয়াফে সদরও বলেছেন।

২৩. হাতিম: বায়তুল্লাহ শরিফসংলগ্ন উত্তর দিকে মানুষসমান প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশ। এটি মূলত কাবাঘরেরই অংশ ছিল। এর ভেতরে নামাজ পড়লে মূল কাবাঘরেই নামাজ পড়ছে বলে মনে করা হয়।

২৪. মাকামে ইব্রাহিম: কাবার পূর্ব দিকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইরাকির মাঝ বরাবর মাতাফে কাচে ঘেরা একটি পাথর। যার ওপর হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন রয়েছে। কাবাঘর নির্মাণের সময় ইব্রাহিম (আ.) এটা লিফটের মতো ব্যবহার করেছিলেন।

২৫. ইফরাদ হজ: হজ আদায়ের তিন প্রকার পদ্ধতি আছে। ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু। এ তিন প্রকারের যে কোনোটি আদায় করলেই ফরজ হজ আদায় হয়ে যায়। আর ইফরাদ হলো শুধু হজের নিয়তে মিকাত থেকে এহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে হজ সম্পাদন করা।

২৬. কিরান হজ: হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) একই সঙ্গে হজ ও ওমরাহর নিয়তে মিকাত থেকে এহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে ওমরাহ করা। মাথার চুল না মুণ্ডিয়ে বা না ছেঁটে ওই এহরামেই হজ করা এবং কোরবানি করা।

২৭. তামাত্তু হজ: হজের মাসসমূহে মিকাত থেকে শুধু ওমরাহর নিয়তে এহরাম বেঁধে ওমরাহ পালন করা এবং মাথা মুণ্ডিয়ে এহরামমুক্ত হয়ে যাওয়া। এরপর এই সফরেই হজের সময় হজের নিয়তে নতুন করে এহরাম বেঁধে হজ পালন করা এবং দমে শোকর বা কোরবানি করা।

২৮. জমজম: ইসমাইল (আ.)-এর পায়ের আঘাতে মক্কার পাহাড়ে পানির কূপ বেরিয়ে এসেছিল। মা হাজেরা দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসেন এবং দেখেন পানিতে পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। তিনি কূপকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জমজম' অর্থাৎ 'থামো থামো'। মুসলিমরা কাবাঘর তাওয়াফ করার পর জমজমের পানি পান করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ উপকারী জ্ঞান দেন, রিজিকের প্রশস্ততা দান করুন এবং সুস্থতাও দান করুন।'

২৯. রওজা: নবী মুহম্মদ (সা.)- এর কবরকে রওজা মোবারক বলা হয়ে থাকে। ইসলামের চার ইমামের সম্মিলিত মত হচ্ছে, রওজা শরিফে নবী (সা.) জীবিত রয়েছেন। তাঁর রওজায় সরাসরি হাজির হয়ে তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার উত্তর দেন। মদিনায় রওজা মোবারক জিয়ারত করা হজের অংশ না হলেও মুসলিম সমাজ সকলেই মক্কা থেকে মদিনায় গিয়ে নবী (সা.)-এর রওজায় হাজির হয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

তথ্যসূত্র

১. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ২০১৫ সংস্করণ।

ড. মোহাম্মদ হাননান: লেখক ও গবেষক

প্রকৃতি, দ্বৈততা ও তাওবাদ

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ

মুক্তি চিরকালই অধরা। মুক্তি অর্জনে মানুষের প্রয়াস সর্বদাই তাকে কেবল এক দাসত্ব থেকে আরেক দাসত্বে নিপতিত করে– যার রূপ হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই কিছু মানুষ মাদক গ্রহণ করে, যাতে করে সে প্রাত্যহিক জীবনের গোলামি থেকে মুক্তি লাভ আর জীবনের বাস্তবতা থেকে পালাতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে সে আরেকটি দাসত্বেই নিপতিত হয়– মাদকাসক্তি। খাঁচা থেকে মুক্ত একটি ইঁদুর মুক্তির পথে পা বাড়ায়, কিন্তু শীঘ্রই তাকে বিড়ালের আক্রোশ থেকে বাঁচতে প্রাণপণে দৌড়াতে হয়। যৌন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে সে আরেকটি বন্ধনের শিকলে বাঁধা পড়েছে– পরিবার। পার্থিব জগতের যান্ত্রিকতায় ক্লান্ত হয়ে মানুষ ধর্মের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আনুষ্ঠানিকতায় বাধা পড়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশগুলো শুরুতে তাদের মুক্তিকে উপভোগ করে, কিন্তু খুব দ্রুতই আবিষ্কার করে যে তারা অন্যান্য বৃহৎ সত্তার অধীনস্থ– যেমন ক্ষমতার কেন্দ্রসমূহ ও বিশ্বব্যবস্থা। মানবিক ও সামাজিক বিদ্যার অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন মানুষের সম্ভাবনার দুয়ারকে উন্মোচিত করে, কিন্তু একই সময়ে তাকে তার নিজের সৃষ্টিতে শৃঙ্খলিত করে। আর পারমাণবিক ও মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যখন তাদের কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ে, তখন সেগুলো কেবল আরেকটি গতিপথেই নিপতিত হয়। তাই মুক্তি চিরকালই থাকে অধরা– এটা কেবল একটি অসংগতি, একটি বিভ্রান্তি, একটি মরীচিকা।

কিন্তু বৃহত্তর পরিসর বিবেচনা করলে মুক্তি ও দাসত্বের যুগপৎ উপস্থিতিই স্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে তা প্রকৃতির দ্বৈততারই বহিঃপ্রকাশ। প্রাচীন চীনের প্রকৃতিবাদী দার্শনিকরা যেমন দুই সহস্রাব্দেরও অধিককাল পূর্বে দাবি করত, প্রকৃতির মৌলিক দ্বৈততায় জড়িত আছে দুটো পরিপূরক ও ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি– যেমন দিন ও রাতের ছন্দ, নারী ও পুরুষ জাতীয় সত্তা, উষ্ণতা ও শীতলতা, আলো ও অন্ধকার, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ভালোবাসা ও ঘৃণা, সুখ ও দুঃখ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণ ইত্যাদি। এই দার্শনিকেরা পুরুষাত্মক গুণকে 'ইয়্যাং' এবং স্ত্রীজাতীয় গুণকে 'ইন' আখ্যা দিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই 'ইয়্যাং' ও 'ইন' প্রতীকদ্বয় তাওবাদের দর্শনকেই ধারণ করত যা লাওসি আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বে প্রচার করেছিলেন। বৈপরীত্যের মধ্যে ভারসাম্য ও সাযুজ্যেরই এটা প্রতিনিধিত্ব করত।

প্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী চীনা দার্শনিকদের মধ্যে লাওসি ও কনফুসিয়াস আজও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাদের দর্শনের মূলকথা ছিল ভারসাম্যের মধ্যে মানুষের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনকে সাজিয়ে রাখা, কারণ স্বর্গের নিচে মানবজাতির আবাসস্থল একটাই। এসব দার্শনিকরা মানব জীবনকে প্রকৃতির একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতেন; আর তারা মনে করতেন, সম্প্রীতির মধ্যে বেঁচে থাকাটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সনাতন চীনা সংস্কৃতিও সম্প্রীতিপূর্ণ মানবিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত, কারণ একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যতিরেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

অতএব একটি সম্প্রীতিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে মানবজাতিকে প্রয়াস চালাতে হবে, যার ভিত্তি হলো মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, পরিবারসমূহের পরস্পরকে সহায়তা প্রদান এবং সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

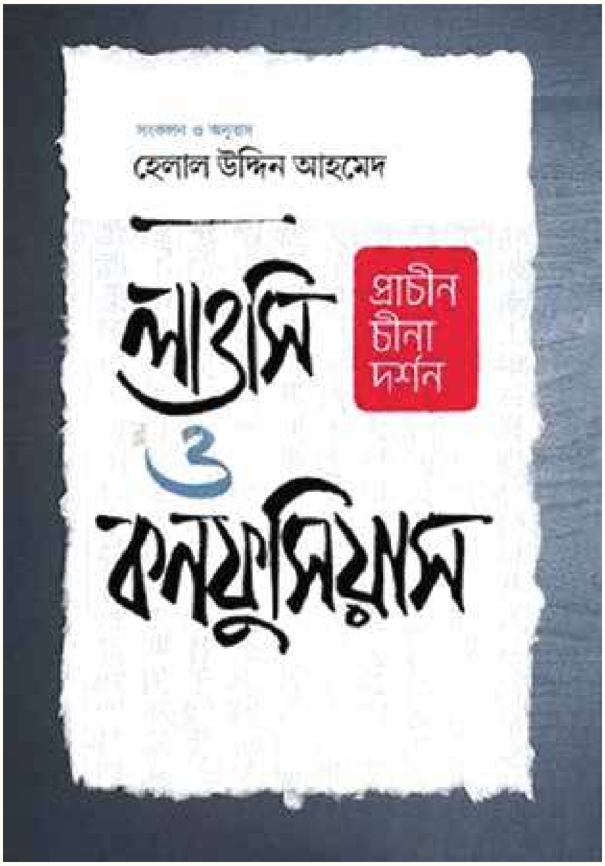

লাওসি চীনা ইতিহাসের 'বসন্ত এবং শরৎ' যুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭০ থেকে ৪৭৬ সাল) তাঁর *তাও তে চিং* বা *চিরায়ত পথ* বইটি রচনা করেন। এর মাধ্যমে তাওবাদ এবং চীনা সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচিত হয়, যা আজও বিরাজমান আছে। লাওসি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী, যে চৌ রাজবংশের শাসনামলে মহাফেজখানা দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের বিশালতার কারণে এমনকি কনফুসিয়াসও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য

বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিতেন। লাওসির বইটিতে ছিল ৫ হাজার চীনা বর্ণমালা। এটা দুই পর্ব (তাও বা পথ এবং তে বা গুণ) ও ৮১টি অধ্যায়ে সাজানো ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীনা সংস্কৃতির প্রসারে কনফুসীয় মতবাদের পাশাপাশি তাওবাদ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তাওকে মনে করা হয় একটি অবিনশ্বর, অন্তহীন ও অপরিবর্তনীয় পন্থা বা সত্তার মতো– যা সমগ্র মহাবিশ্বে বিরাজমান, কিন্তু যাকে কখনোই পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা, বোঝা বা অনুভব করা সম্ভব নয়। চীনা দর্শনের অনেকগুলো ধারাই নৈতিকতাসম্পন্ন জীবনযাপনের সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু তাওবাদ এটাকে বিমূর্ত বা নিরাকার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এটা নিষ্ক্রিয়তা, কোমলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও আপেক্ষিকতার শক্তির কথা বলে। বস্তুত, অনেক চীনা পণ্ডিতই বাহ্যিক জীবনে কনফুসীয় মতবাদ এবং মানুষের অন্তর্লোকে তাওবাদ চর্চার কথা বলেছেন। এটা জীবনে দ্বৈততার অস্তিত্বের সঠিক মূল্যায়ন করে। একই সাথে মানবকল্যাণে গৃহীত অনেক উদ্যোগই যে অনেক সময় দুর্যোগ বয়ে আনে সেটাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা প্রকৃতির কার্যপ্রণালিতে ক্ষতিকর হস্তক্ষেপের পরিবর্তে প্রকৃতির পরিবর্তন, চক্রের বিবর্তন ও রূপান্তরকে গ্রহণ করা ও তার সঙ্গে মানিয়ে চলার সুপারিশ করে। তাওবাদ ঈশ্বর বা স্বর্গের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের ওপরও সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে।

তাওকে বিবেচনা করা হতো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার ঊর্ধ্বে একটি রহস্যময়, সর্বব্যাপী সত্তা হিসেবে। এটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল মহাবিশ্ব, প্রাকৃতিক জগৎ ও মানুষের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র বোঝার জন্য। দুটো বিপরীতমুখী শক্তি– 'ইন' ও 'ইয়্যাং' দ্বারা একে ব্যাখ্যা করা যায়। এই দুটি শক্তি পরিপূরক ও পরস্পর নির্ভরশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন করে। প্রকৃতিতে উৎপাদন, প্রজনন ও রূপান্তরের অন্তহীন চক্রকে এই দুটো শক্তির বৈপরীত্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তাওবাদ মূলত এই বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরেছে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো সুস্বাস্থ্য, সামাজিক ভারসাম্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের নিজের সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি নিয়ে আসা।

লাওসির দর্শন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চীনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন চীনা সমাজের বিকাশে তাওবাদের চর্চা ও আদর্শ যথেষ্ট অবদান রেখেছে। পরবর্তীকালে তাওবাদের সংস্পর্শে এসে চীনে বৌদ্ধ ধর্মও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এর প্রভাব জাপানের আদি শিন্টো ধর্মেও দেখা যায়। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর চীনে বিভিন্ন আকারে, প্রকারে, রূপ, প্রক্রিয়া ও চর্চায় এটা আজও টিকে আছে।

নৈসর্গিকতা ও নিষ্ক্রিয়তা তাওবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। নৈসর্গিকতার অর্থ জগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বেরই নিজস্ব প্রাকৃতিক ধারার বিদ্যমানতা। যেমন পাখি আকাশে ওড়ে, মাছ জলে সাঁতার কাটে, মেঘমালা আকাশে ভাসে এবং ফুল ফোটে। এসব ঘটনা মানুষের ইচ্ছায় নয়, বরং প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। তাই প্রাকৃতিক কোনোকিছুকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত নয়; মানুষের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ এবং বিবাদ নিরসনে প্রাকৃতিক পন্থা অনুসরণ করা উচিত। অন্যদিকে, নিষ্ক্রিয়তার অর্থ হলো নৈসর্গিকতা নিশ্চিত করা। এখানে লাওসি বলতে চেয়েছেন, মানবিক উদ্যোগের ভিত্তি হওয়া উচিত নৈসর্গিকতা– প্রকৃতির ছন্দকে বাধাগ্রস্ত করা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে মানবের সৃজনশীলতা বিকাশের ওপর লাওসি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নৈসর্গিকতা ও নিষ্ক্রিয়তার ধারণার ভিত্তিতে লাওসি দুর্বল কর্তৃক সবলকে অতিক্রমণের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। মানুষের বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত হয়; আর এসব সংঘাতই যুদ্ধের জন্ম দেয়। লাওসি তাই নির্বিবাদ ধারণাটি উপস্থাপন করেন, কারণ তাঁর মতে মানুষের প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্বই হলো সংঘাত ও যুদ্ধের মূল কারণ। তিনি মনে করতেন, কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করাই হলো প্রাকৃতিক পন্থায় জীবনযাপন– যা বহু বৈশ্বিক ধর্মই সমর্থন করে।

লাওসির মতে সর্বোৎকৃষ্ট গুণ হলো জলের মতো। তিনি ব্যাখ্যা দেন: 'জল সবকিছুর জন্যই পুষ্টি জোগায়, কিন্তু কোনোকিছুর জন্য প্রতিযোগিতা করে না'। মানুষ উচ্চতর অবস্থান কামনা করে, কিন্তু জল নিচু স্থানের দিকে গড়ায়। যা কিছু তার কাছে নিকৃষ্ট মনে হয় মানুষ তাকে ঘৃণা করে, কিন্তু যা কিছু তার উত্তম মনে হয় তাকে সে পছন্দ করে। এর বিপরীতে জল সর্বদা নিচের দিকেই প্রবাহিত হয় এবং জীবনের উৎস হিসেবে সকল জীবিত প্রাণীর পুষ্টি জোগায়। লাভ বা লোকসানের তোয়াক্কা না করে জল জগতের মঙ্গল সাধনে অবদান রাখে এবং স্বর্গের নিচে সবকিছুকেই নিজ অঙ্গে প্রতিফলিত করে।

তার দুর্বলতা ও নীরবতার মাধ্যমেও জল বিশাল শক্তি সঞ্চয় করে। লাওসি যেমন বলেছিলেন, 'জলের চেয়ে দুর্বল কোনো কিছুই পৃথিবীতে নাই। অথচ শক্ত কোনো কিছু ভাঙতে হলে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নাই'। এটা সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কারণ জল কোনো কিছু কামনা করে না, কোনো কিছুর জন্য দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হয় না। অতএব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের বাসনা বিসর্জন দিয়ে ও নিচু অবস্থান বজায় রেখে মানুষকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, জল যেমনটি করে এবং তা করতে হবে দুর্বলকে নিপীড়ন না করেই। এটা কেবল প্রগতির একমাত্র পথ নয়, জীবন টিকিয়ে রাখারও একমাত্র পন্থা।

অহংকার ও প্রলোভনে উন্মত্ত এক বিশ্বে লাওসি অত্যন্ত সরল ও নির্বিরোধ জীবনযাপন করতেন। তিনি মনে করতেন, নবজাতকের পর্যায়ে ফিরে যাওয়াই হলো ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নের সর্বোচ্চ ধাপ। পৃথিবীতে আগমনের পরে মানুষ ক্রমাগত বাহ্যিক জ্ঞান

আহরণ করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি মেনে নেয়। কিন্তু তার আদি ও বিশুদ্ধ মন ক্রমেই বিশৃঙ্খল রঙে দূষিত হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কপটতাও বৃদ্ধি পায়। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার ফলে সে তার প্রকৃত সত্তাকে হারিয়ে ফেলে। লাওসির মতে, এক হিসেবে সভ্যতা হলো নিজের প্রকৃত সত্তা হতে ক্রমে দূরে সরে যাওয়া।

তিনি মানব-সংস্কৃতির বিকাশকে একটি সজ্জীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতেন, যেখানে পোশাক হয়ে পড়ে শরীরের অলংকার, আবাসন হয়ে পড়ে জীবনধারার ভূষণ, ভাষা হয়ে পড়ে যোগাযোগের চিত্রণ এবং মানব সংগঠন সুশোভিত হয় রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মাধ্যমে। কিন্তু এসব অলংকার অনেক সময় হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক বাসনা, যে কারণে মানুষের মধ্যে ঘটে বিবাদ, ছলচাতুরী এবং যুদ্ধ। লাওসি প্রাকৃতিক ও মানবিক নিয়মেরও সহজ তুলনা করেছেন। প্রকৃতি উদ্বৃত্ত হতে গ্রহণ করে ঘাটতি মেটায়, যেমন বাতাস বালুর পাহাড়কে সমান করে এবং জল মৃত্তিকা ও পাথরকে ধুয়ে দেয়। এর বিপরীতে মানবসভ্যতা উল্টো আচরণ করে, যেখানে দরিদ্ররা ডাকাতির শিকার হয়, আর দুর্বলরা হয় নির্যাতনের। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলি আমাদের বিবাদপূর্ণ সমসাময়িক বিশ্বের জন্য আজও প্রাসঙ্গিক, যা ব্যাপক ক্ষুধা, রোগশোক, বঞ্চনা, নিপীড়ন, বৈষম্য, অন্তহীন যুদ্ধবিগ্রহ, এবং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ দ্বারা সর্বদা জর্জরিত।

লাওসির মতবাদের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রকৃতি যেন মহাবিশ্বকে দ্বৈততার একটি আচ্ছাদন দ্বারা ঢেকে রেখেছে। এই আকুলতা আমাদের মতো জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ফলে জেগে থাকার ক্লান্তিতে আমরা নিদ্রার কাছে আত্মসমর্পণ করি। শহুরে জীবনযাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে আমরা পল্লির সবুজের দিকে ছুটে যাই, আর প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলতে চলতে অসুস্থ হয়ে আমরা অবসর ও বিশ্রাম বেছে নিই। দিনের আলোয় বিরক্ত হয়ে আমরা রাতের অন্ধকারকে স্বাগত জানাই। আর বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে আমরা অবশেষে মৃত্যুকেই বরণ করে নিই।

উপরের কথাগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে জীবনের ফসল সবসময় দ্বিমুখী। ফলে, কেউ যখন সম্পদের আশীর্বাদ পায়, তাকে দায়ের বোঝাও বয়ে বেড়াতে হয়– অনেকটা আমাদের হিসাব খাতার ব্যালান্স-শিটের মতো। একই যুক্তিতে জোয়ারের পরে আসে ভাটা, ঢেউ উপরে উঠে নামে নিচে, আর শক্তির প্রয়োগ ঘটালে বিপরীতমুখী শক্তির উদ্ভব ঘটে, ঠিক যেমনটি স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনশো বছরেরও পূর্বে বলেছিলেন। এটা তাই স্বাভাবিক যে মুক্তি ও দাসত্ব একসঙ্গে হাতে হাত ধরে চলে। জীবন হলো একটি মিশ্র আশীর্বাদ, আর বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐকতান ও ভারসাম্য বজায় রাখাই হলো সাফল্য অর্জনের সেরা কৌশল।

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, hahmed1960@gmail.com

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা ও সেবা নিশ্চিতের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ১৩ই মে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব নির্দেশ দেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো স্থাপন, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি –প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এ তথ্য জানায়।

প্রেস উইং জানায়, সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মর্যাদা ও সক্ষমতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এমন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সব কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার বিষয় তুলে ধরেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবন নির্মাণ নীতিমালায় হাসপাতাল, রেস্টুরেন্টসহ সরকারি ও বেসরকারি সব স্থাপনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যাতায়াতের উপযোগী অবকাঠামো ও টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কক্ষের দরজা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যাতে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা সহজেই প্রবেশ করতে পারেন। নারীদের জন্য চালুর পরিকল্পনায় থাকা ইলেকট্রিক বাসেও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপর জোর দেন তিনি।

এছাড়া সারাদেশে পরিচালিত প্রতিবন্ধী স্কুলগুলো সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলেন তিনি। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রাথমিকভাবে ১০ জেলার ১০ উপজেলায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিত করতে 'শিশু স্বর্গ' প্রকল্প চালু করা হবে। দ্রুত এ কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানানো হয়।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্য

কমল চৌধুরী

বিশ্বে ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। মে দিবস বিশ্বের সকল শ্রমিক ও মেহনতি জনতার কাছে এক মহান দিবস হিসেবে বিবেচিত। মে দিবস একই সাথে বেদনার, বিজয় উৎসবের ও সংগ্রামী শপথ নেবার দিন। এর ইতিহাস অনেক পুরানো। পৃথিবীতে বহু আন্দোলন বিপ্লব রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মে দিবসের ঘটনা এমনই আবেদনময় হয়েছিল যে তা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে সাড়া জাগিয়েছিল। বহু বছর পূর্বে শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে যে রক্ত গোলাপ বিকশিত হয়েছিল, তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমন এক সময় ছিল যখন শ্রমিকদের সূর্য ওঠার সাথে সাথে কাজ শুরু করতে হতো আর সূর্য ডোবার অনেক পরে বাড়ি ফিরতে হতো। এর বিনিময়ে তাদেরকে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য সামান্য অর্থ দেওয়া হতো। অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকার শ্রমিকেরাও রুটিরুজির জন্য কেনা গোলামের মতো কাজ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে নিয়ম পাল্টাতে শুরু করে। শ্রমিকরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এ অপরিসীম কর্মের বিরুদ্ধে। তারা ধর্মঘটে শরিক হয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়।

তথাপি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ট্রেড ইউনিয়ন হলো বেতনভোগী শ্রমিকদের এক স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক সংগঠন যার সদস্যরা স্বেচ্ছায় এর সদস্যপদ গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যৌথ ও কার্যকরী প্রচেষ্টা নেয়। আবার একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন মিলিত হয় একটা ফেডারেশনে।

১৭৮৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার আগেও ১৬৮৪ সালের দিকে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম ঠেলাগাড়িওয়ালাদের সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৭৭০ সালে একই স্থানে পিপা প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার বছরেই ফিলাডেলফিয়ার ছাপাখানার ঠিকা শ্রমিকরা সর্বপ্রথম ধর্মঘট আন্দোলনের সূচনা করে এবং দাবি আদায় করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ধর্মঘট আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে ১৮৪২ সালে ফিলাডেলফিয়াতে ১৫টি শ্রমিক ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে নাম রাখে 'ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন'। এটাই বিশ্বের প্রথম ফেডারেশন হিসেবে বিবেচিত। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণি নিজ নিজ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে থাকে। ১৮৬৪ সালে ব্রিটেনে মার্কস ও এঞ্জেলসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সমিতি'। ইতিহাসে এটাই 'প্রথম আন্তর্জাতিক' নামে খ্যাত। ১৮৬৬ সালের আগস্টে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা আমেরিকার বালটিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করেন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। এর সভাপতি নির্বাচিত হন মার্কিন শ্রম আন্দোলনের পুরোধা উইলিয়াম এইস সিভিস। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। এ ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে '৮ ঘণ্টা শ্রমিক সমিতি।' ৮ ঘণ্টার আন্দোলন সমগ্র আমেরিকায় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তার প্রমাণ শ্রমিকদের কণ্ঠে গাওয়া গান–'উই আর সামনিং আওয়ার ফোর্সেস ফ্রম শিপইয়ার্ড/শপ অ্যান্ড মিল/এইট আওয়ার্স ফর ওয়ার্ক/এইট আওয়ার্স ফর রেস্ট/এইট আওয়ার্স ফর হোয়াট উই উইল (কলকারখানা বন্দর থেকে/বাজাই যে রণডংকা/শ্রম বিশ্রাম আনন্দ সবই/এক একটি আট ঘণ্টা)। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্যারিসের শ্রমিকরা শহর থেকে বুর্জোয়া শাসকদের হঠিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ৩০শে এপ্রিল ২০২৬ ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন বেগম রোকেয়া সরণিতে মহান মে দিবস এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় আয়োজিত র‍্যালিতে অংশ নেন– পিআইডি

ক্ষমতা নেয়। মার্কস, এঙ্গেলস লিখেছেন— এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১০ দিন পরে ২৮শে মার্চ তারা গঠন করেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র কমিউন। একেবারে নতুন রাষ্ট্র হলেও তা শাসিত হয়েছিল জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। তার সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল শ্রমজীবী জনগণের জন্য, সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে। কমিউন বেঁচেছিল মাত্র ৭২ দিন। কমিউনের বীরত্বের কাহিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সে সময় ৩০ হাজার মেহনতি মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দেন শাসকগোষ্ঠীর হাতে। প্যারিসে কমিউনের ব্যর্থতার পর প্রথম আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়। যদিও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অস্তিত্ব শেষাবধি লোপ পায়।

১৮৭৫ সালে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা খনির মালিকদের ষড়যন্ত্রে ১০ জন খনি শ্রমিক ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। এ ঘটনার জের হিসেবে ১৮৭৭ সালে লক্ষ লক্ষ রেল, ইস্পাত ও খনি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। তারা ৩০০ জন সাথীকে হারায়, মালিক পক্ষ এবারও জয়ী হয়। কিন্তু সংগ্রামের কাফেলা থামেনি। এগিয়ে চলেছে সামনে, আরও সামনে। অতঃপর ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকার 'ফেডারেশন অব লেবার' সুদীর্ঘ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ক্ষণে ঘোষণা করে '১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে।' এলো ১লা মে শনিবার। সারা আমেরিকায় যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল শিকাগো। ১লা মে'র আগের রবিবারে শিকাগো শহরে ২৫০০০ শ্রমিকের এক বিরাট জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ১লা মে হাজার হাজার শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। মিশিগান এভিনিউর চত্বরে বিশাল শ্রমিক জমায়েত এবং স্লোগান সমৃদ্ধ মিছিল লেক ফ্রন্টে শেষ হয়। শ্রমিক শ্রেণির সংহতিকে শোষক শ্রেণি সুনজরে দেখতে পারেনি। এতদিনের অনুগত শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ২রা মে ছিল রবিবার, ছুটির দিন। আলবার্ট আর পার্সনস সেদিন সিনসিন্নাটি গিয়ে বক্তৃতা করেন। ৩রা মে ম্যাককমির রিপার কারখানার শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ৬ জন শ্রমিক নিহত এবং অনেকে আহত হয়। ৪ঠা মে এ গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলছিল শান্তিপূর্ণভাবে। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক নেতা আলবার্ট আর পার্সনস। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। শেষ বক্তা ফিলডেনের বক্তৃতা শেষে দূর থেকে এসে পড়ল একটা বোমা। আকাশ হয় প্রকম্পিত। নিহত হয় জনৈক পুলিশ সার্জেন্ট। আর সাথে সাথে শুরু হয় পুলিশের গুলিবর্ষণ। এবার কিন্তু শ্রমিকরাও রুখে দাঁড়ায়। ৪ জন শ্রমিক মারা যায়। ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। হে মার্কেট স্কোয়ার রক্তে লাল হয়ে যায়। সভায় উপস্থিত এক শ্রমিক তার জামা খুলে ভিজিয়ে নেয় রক্তে। রক্তে ভেজা লাল জামাটি উড়িয়ে দেয় পতাকা হিসেবে। সেই পতাকাই আজ শ্রমিক শ্রেণির লাল ঝাণ্ডা–সংগ্রামের বিজয় পতাকা।

হে মার্কেট স্কোয়ারের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর চলে নির্যাতন। কারাবরণ করে অনেক শ্রমিক। আয়োজিত হয় বিচারের নামে প্রহসন। ১৮৮৬ সালের ২১শে জুন শিকাগোতে বিচার শুরু হয়। আসামি ছিলেন অগাস্ট স্পাইজ, জর্জ এঞ্জেল, এডলফ ফিশার, মাইকেল স্কোয়ার, সাম ফিলডেন, লুইস লিংগ ও অস্কার নীবে। পার্সনস তখন পলাতক। কিন্তু বিচারের প্রথম দিনে আদালতে সহসা হাজির হলেন পার্সনস। বললেন, 'হে মানবীয় বিচারক, আমি এসেছি আমার নিরপরাধ কমরেডদের সাথে বিচারের সম্মুখীন হতে।' অপর নেতা স্পাইজ আদালতে বলেছিলেন, 'অভাবে ও কষ্টে খেটে খাওয়া লাখো লাখো নিষ্পেষিতরা যে আন্দোলনে তাদের মুক্তির আশা দেখে, তোমরা যদি ভেবে থাক যে আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই শ্রমিক আন্দোলনকে উচ্ছেদ করতে পারবে, যদি এটাই তোমাদের মত হয়– তবে দাও আমাদের ফাঁসি। যেখানে একটা স্ফুলিঙ্গের উপর পা দেবে সেখান থেকেই তোমাদের পেছনে, সামনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে লেলিহান অগ্নিশিখা– এটা ভূগর্ভের আগুন। তোমরা তা নেভাতে পারবে না।'

১৮৮৬ সালের ৯ই অক্টোবর এ প্রহসন বিচারের রায় বের হয়, শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদণ্ডের রায়। সকল জনমতকে উপেক্ষা করে ১৮৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয় ৪ শ্রমিক নেতাকে। এরা হলেন আলবার্ট আর পার্সনস, এডলফ ফিশার, জর্জ এঞ্জেল ও অগাস্ট স্পাইজ। স্কোয়ার ও ফিলডেনকে দীর্ঘমেয়াদি সাজা দেওয়া হয়। লুইস লিংগকে জেলের বদ্ধ কামরায় মৃত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জেল, জুলুম আর ফাঁসি দিয়ে আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা যায়নি। পৃথিবীর সকল শ্রমিক এ আন্দোলনকে সমর্থন করে, স্পাইজের উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

প্রতিবছর ১৪ই জুলাই 'ফরাসি বিপ্লব' দিবস পালন করা হয়। এই দিনে ঐতিহাসিক বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে। ১৮৮৯ সাল ছিল বাস্তিল দুর্গ পতনের একশত বছর। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমবেত হন বিশ্বের ৪৬৭ জন শ্রমিক প্রতিনিধি। গঠিত হলো 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।' আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসেই ১লা মে-কে মহান মে দিবস রূপে। শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮৯০ সাল থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রমিকরা প্রথম বারের মতো 'মে দিবস' পালন করে। পরবর্তীতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'– এই সাহসী উচ্চারণ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের কাছে হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। তাই ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এটা কোনো একটি বিশেষ দেশ বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই আন্দোলনের স্বীকৃতি মেলে ১৯১৯ সালে ত্রিপক্ষীয় সংগঠন আইএলও প্রতিষ্ঠার পর। পঞ্চম কনভেনশনেই প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে কাজের সময়। বিশ্বের শতাধিক দেশ উক্ত ১ নম্বর কনভেনশন অনুসমর্থন করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশে মে দিবস

মে দিবসের পরিচিতি মার্কিন শ্রমিকদের রক্তে রাঙিয়ে, তথাপি সেখানে মে দিবস পালনের সরকারি স্বীকৃতি দেখা যায় না। ১৯২৮ সাল থেকে ১লা মে-কে যুক্তরাষ্ট্র সরকার 'শিশু স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। হিটলার ১৯৩৩ সালে মে দিবসকে 'জাতীয় শ্রম দিবস' ঘোষণা করে এবং ২রা মে থেকে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাধীনতা অর্জনের আগে মে দিবস পালনের ইতিহাস কমই মেলে। চীনে ১৯২৪ সালে সান ইয়াতসেনের আমলে মে দিবস পালিত হয়। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম মে দিবস পালনের কথা জানা যায়।

কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গাবালেভু চেট্টিয়ার মেয়ের মাড়ির অংশ কেটে মে দিবসের লাল পতাকা তোলা হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় ১৯২৭ সালে প্রথমবারের মতো মে দিবস পালিত হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪৭ সালের আগেও সীমিত পরিসরে মে দিবসের, মিছিল বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৪৮ সালে প্রথম পাকিস্তানে মে দিবস পালিত হয় ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে। কারণ তখন চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়ন মে দিবসের একটি প্রকাশ্য সভা আয়োজন করে। (*একতা- ১৭.৪.১৯৮০*)

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মে দিবস সীমিত পরিসরেই পালিত হয় । ১৯৫৩ সালে পল্টনে মে দিবসের জমায়েত হয়। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রথমবারের মতো বিপুল উৎসাহে দিনটি পালন করে। আদমজীতে ৩০ হাজার শ্রমিক লাল পতাকা নিয়ে সভা ও মিছিলে অংশ নেয়। ১৯৫৫ সালে আবার ৯২-এর ক ধারা বলবৎ থাকার কারণে দিবসটি সীমিত গণ্ডিতে উদ্‌যাপিত হয়। অতঃপর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত মে দিবসে বেশ বড়ো আকারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ সময় ১লা মে-তে ছুটি প্রদানের দাবি ওঠে। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মে দিবস পুনরায় সীমিতভাবে পালিত হয়। ১৯৬৪ সালে ব্যাপকভাবে মে দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের ভেতর একতাবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ১৯৬৫ সালে পল্টনে জমায়েত হলেও ১৯৬৬ সালে সভার অনুমতি কর্তৃপক্ষ দেয়নি। ১৯৬৭ সালে বায়তুল মোকাররমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে নির্ধারিত কর্মসূচি মাক্সিম গোর্কির 'মা' নাটক প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর পতন হলেও সামরিক আইন বলবৎ থাকার কারণে প্রকাশ্যে মে দিবস পালিত হয়নি। তবে ১৯৭০ সালে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। ১৯৭১ সালে কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মে দিবসের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। স্বাধীনতার পর বহুল কাঙ্ক্ষিত মে দিবস সরকারি স্বীকৃতি পায় ও ১লা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মে দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। অতঃপর কখনো এককভাবে, কখনো সংঘবদ্ধভাবে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। কখনোবা তা সীমিত কিংবা বিস্তৃত পরিসরে মে দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মে দিবস বাংলাদেশে সরকারিভাবে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মে দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তথাপি মে দিবস বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটা মহান দিবস এবং একটা জনপ্রিয় দিন। তাই বাংলাদেশে মে দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

কমল চৌধুরী: নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সকালের সময়

ডিজিটাল নাগরিকত্ব: স্ক্রিনের নৈতিক দায়

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

কোনো মহল্লায় বা শহরে কেউ গুজব ছড়ালে তাকে দায়ী করা হয়। ফেসবুকে বা ইউটিউবে সেই একই কাজ করলে তার দায় কি কমে যায়? যে নাগরিকত্ব বাস্তব জীবনে নৈতিকতার শর্তে বাঁধা, সেই একই শর্ত কি মোবাইলের স্ক্রিনে এলেই শিথিল হয়ে যায়? উত্তর স্পষ্ট-না। আর এই না-বোধক উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিয়েছে 'ডিজিটাল নাগরিকত্ব' ধারণাটি। যে ধারণার ফলোআপ হিসেবে সারা পৃথিবীতে এখন ভার্চুয়াল জগতের আচরণবিধি নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

একটি স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ হাতে নিলে আমরা ভাবি বিশ্বজগৎ হাতের মুঠোয়। অগণিত মানুষের সঙ্গে মুহূর্তে যুক্ত হওয়া যাচ্ছে। এই ক্ষমতা নিয়ে আমরা গর্বিত। কিন্তু এই ক্ষমতার সঙ্গে যে দায়িত্বের পাল্লাটাও ভারী হয়ে উঠছে, সেটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

ডিজিটাল নাগরিকত্ব আসলে নতুন কোনো ধারণা নয়। এটি পুরানো মানবিক মূল্যবোধেরই নতুন ঠিকানা। সত্য বলা, অন্যকে সম্মান করা, ভুল করলে স্বীকার করা– এই শিক্ষা আমরা ছোটোবেলায় বাড়িতে পেয়েছি, স্কুলে পেয়েছি। ডিজিটাল নাগরিকত্ব বলছে, এই শিক্ষা স্ক্রিনের সামনে বসলেও ভুলে যাওয়া চলবে না। ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ধারণার সঙ্গে যোগ করেছে সহমর্মিতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক আলোচনায় অংশ নেওয়ার মানসিকতা। সহজ কথায়, ফোন চালাতে জানলেই ডিজিটাল নাগরিক হওয়া যায় না। নিজের একটি পোস্ট বা একটি শেয়ার কার জীবনে কী প্রভাব ফেলছে, সেটা বোঝার বিবেকটাও থাকতে হয়।

ডিভাইস ব্যবহারে জবাবদিহি

আমরা যখন ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করি, তখন সেখানেও আমাদের নাগরিক পরিচয় আমাদের সঙ্গে যায়। সেই পরিচয় বহন করার অর্থ হলো স্বচ্ছতা, সংযম এবং অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। এখানে কোনো পুলিশ নেই, কোনো বাধা নিয়ম নেই– সবকিছু নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজস্ব বিবেক ও দায়িত্ববোধের ওপর। নীতিবোধ, অধিকারের সীমানা সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিজের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি– এই তিনটি মিলিয়েই তৈরি হয় একজন প্রকৃত ডিজিটাল নাগরিকের চরিত্র।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশ এই দায়িত্বকে আরও জটিল করে তুলেছে। এআই দিয়ে বানানো ভুয়া ভিডিও, বিকৃত ছবি বা স্বয়ংক্রিয় প্রচারণা এখন মুহূর্তে জনমত বদলে দিতে পারে। তাই সাইবার বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন 'ডিজিটাল সহনশীলতা'র কথা অর্থাৎ আবেগ ও বিভ্রান্তিতে না ডুবে শান্ত মাথায় তথ্য যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতাই এর মূল কথা। এই সক্ষমতাই এখন একজন সুনাগরিকের সবচেয়ে জরুরি গুণ।

বাংলাদেশে এখন একটি নতুন গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। মানুষের প্রত্যাশা, ডিজিটাল পরিসর নাগরিকের কণ্ঠকে আরও জোরালো করবে, তথ্যের আলো আরও দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টো চিত্রটাই বেশি চোখে পড়ছে। যে মাধ্যমে সচেতনতা ছড়ানোর কথা, সেই মাধ্যমে ছড়াচ্ছে গুজব, জমছে বিদ্বেষ, চলছে দায়হীন কথাবার্তা।

এই সমস্যার জন্য শুধু অচেনা ট্রলকারীদের দোষ দিলে পুরো সত্য বলা হয় না। অনেক পরিচিত মুখ যাদের কথায় লক্ষ মানুষ কান দেন, তাদের একটা বড়ো অংশ সেই বিশ্বাস ও প্রভাবকে ব্যবহার করছেন স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে। যত বড়ো মঞ্চ, তত বড়ো দায়– এই সহজ সত্যটি তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই দায়মুক্তির সংস্কৃতিই এখন বাংলাদেশের ডিজিটাল দুনিয়ার সবচেয়ে গভীর সমস্যা।

অ্যালগরিদমের অর্থনীতি ও অ্যাকটিভিস্টদের বিবেক

একজন ইউটিউবার দাবি করেন, তিনি মানুষকে সচেতন করছেন। একজন ফেসবুক অ্যাকটিভিস্ট বলেন, যা সবাই বলতে ভয় পায়, তিনি তা বলছেন। একজন পডকাস্ট বক্তা বা রাজনৈতিক ভাষ্যকার নিজেকে সাধারণ মানুষের পক্ষের কণ্ঠস্বর

হিসেবে দাবি করেন। পরিচয় আলাদা, ভাষা আলাদা, প্ল্যাটফর্মও আলাদা হতে পারে কিন্তু দাবিটা প্রায় সবার একই।

এখানে একটি অস্বস্তিকর সত্য আছে। সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম শান্ত, তথ্যনির্ভর কনটেন্টকে সামনে আনে না। সে উত্তেজনাকে, ক্রোধকে, বিভাজনকেই প্রকারান্তরে পুরস্কৃত করে। কারণ মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তার পক্ষের কনটেন্ট বেশি দেখে। যা উত্তেজক, তার প্রতি মানুষ বেশি ঝোঁকে। বেশি ভিউ মানে বেশি আয়। ফলে অনেক কনটেন্ট নির্মাতা সচেতনভাবেই বেছে নেন উসকানিমূলক পথ, কারণ সেটাই লাভজনক। যাচাই না করা তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বানানো ছবি বা ডিপফেক বা ফটোকার্ড বা উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ তাই শুধু অসতর্কতার ফল নয়, অনেক সময় এটি একটি পরিকল্পিত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত।

এই অসতর্কতার বা উদ্দেশ্যমূলকতার মাশুল দিতে হয় রাস্তায়, পাড়ায়, এমনকি ঘরে ঘরে। অনলাইনের গুজব থেকে জনতা রাস্তায় নামে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক হট্টগোল তো প্রায় নিয়মিত ঘটনা। ইনফ্লুয়েন্সাররা যখন এই বয়ানগুলো আরও জোরালোভাবে ছড়িয়ে দেন, তখন সেটা আর মতপ্রকাশের অধিকারের পর্যায়ে থাকে না, তা হয়ে ওঠে অন্যের ক্ষতির কারণ। অ্যালগরিদমের অর্থনীতিকে পুঁজি করে যারা বিভ্রান্তি ও বিভাজন ছড়াচ্ছেন, তারা আর যে পরিচয়ের দাবিই করুক না কেন, ডিজিটাল নাগরিকত্বের দাবিদার তারা কখনোই হতে পারবেন না। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজিটাল সংযোগকে অনলাইনে এবং বাস্তব জীবনেও বিশৃঙ্খলার হাতিয়ার বানাচ্ছেন, যা সুনাগরিকের লক্ষণ না।

সুনাগরিকত্ব অর্জনের উপায়

তাহলে আমাদের করণীয় কী? বিশ্বে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদগণসহ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সহায়তা সংস্থাগুলো এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে কাজ করছে। এর মধ্যে ডিজিটাল শিষ্টাচার, ডিজিটাল সাক্ষরতা, ডিজিটাল অধিকার ও দায়িত্ব এবং অনলাইন নিরাপত্তার মতো ধারণাগুলো অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এখন মনে করছে, ডিজিটাল নাগরিকত্ব শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতার বিষয় নয়; এটি মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সহমর্মিতা এবং ভিন্ন মতকে সম্মান করার সংস্কৃতির সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। ডিজিটাল নৈতিকতা নিয়ে স্কুল পর্যায় থেকেই কাজ শুরু করা উচিত বলে অধিকাংশ দেশের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন এবং সে অনুযায়ী অনেক দেশেই শিশু-কিশোর বয়স থেকেই ডিভাইস ব্যবহারে দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের শেখানো হচ্ছে— অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নিজের কথার প্রভাব কী হতে পারে, তা অনুমান করার পারঙ্গমতা অর্জন করাও। ভুল তথ্য ছড়ানোর আগে ভাবা এবং ভিন্নমতের মানুষের প্রতি সম্মান বজায় রাখাও শেখা জরুরি। মানুষের শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার জানলেই হবে না; অনলাইনে তার কর্মকাণ্ডের সামাজিক প্রভাব ও পরিণতিও বোঝার সক্ষমতা থাকতে হবে।

ইউনেস্কোর এক জরিপে দেখা গেছে, এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলোতে ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্র এখনো অনেকে পিছিয়ে আছে। এসব দেশে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ডিজিটাল সৃজনশীলতা ও নতুন কিছু তৈরি করার দক্ষতার দিক থেকে এ অঞ্চলের

শিক্ষার্থীরা খুব একটা এগোতে পারেনি। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনলাইনে নিরাপদ থাকা এবং বিপদ সামলানোর ক্ষেত্রে ছাত্রীরা শিক্ষকের পরামর্শ থেকে বেশ উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষকদেরকে কীভাবে এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আরো দক্ষতার সাথে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ইউনেস্কো একটি গাইডলাইনও প্রণয়ন করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন ও দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধু আংশিক বা খণ্ডিত উদ্যোগে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। বাস্তবতা মাথায় রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

সমাজে যে দায়িত্বশীল মানুষের অভাব, তা কিন্তু নয়। যিনি সত্য যাচাই করে পোস্ট দেন, যিনি উত্তেজনার মুহূর্তে সংযম দেখান, যিনি ভুল করলে সেটা স্বীকার করেন— এই মানুষগুলো আছেন, কিন্তু তারা পর্দার আড়ালেই থেকে যান। অ্যালগরিদম তাদের সামনে আনে না। রাষ্ট্র, গণমাধ্যম ও প্ল্যাটফর্মগুলোকে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, নৈতিক কনটেন্টকে বেশি বেশি দৃশ্যমান করা হবে, ফ্যাক্ট-চেকিংকে শক্তিশালী করা হবে এবং ভুল স্বীকার করাকে দুর্বলতা নয়, সাহসিকতা হিসেবে দেখা হবে।

এই কাজে সমাজের ভেতর থেকেও আওয়াজ তোলা দরকার। আলেম, শিক্ষক, স্থানীয় নেতারা যখন গুজব ও সহিংসতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেন, তখন বিদ্বেষের যে নৈতিক মোড়ক, সেটা খুলে পড়ে। ধর্মের নামে বা দেশপ্রেমের নামে যে মিথ্যা ছড়ানো হয়, পরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষের প্রতিবাদই তার সবচেয়ে কার্যকর জবাব।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই দায় নিতে হবে। বাংলা ভাষায় কনটেন্ট পর্যবেক্ষণে অবহেলা, ক্ষতিকর পোস্ট সরাতে দেরি এবং স্বচ্ছতার অভাব মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম মানে শুধু ব্যবসার জায়গা নয়, এটি পুরো পৃথিবী নামক গ্রহের তথ্যের ইকোসিস্টেম। সেই সিস্টেম দূষিত হলে কারোরই দায় এড়ানোর সুযোগ থাকে না।

আইনের প্রশ্নেও স্পষ্টতা দরকার। ক্ষতিকর আচরণ আর বৈধ মতপ্রকাশের মধ্যে সীমারেখা যদি অস্পষ্ট থাকে, তাহলে আইন নিজেই সমস্যা হয়ে ওঠে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রেখেই ক্ষতিকর কনটেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট আইন।

আঙুল চালানোর আগে একবার থামুন ও ভাবুন

একটু ভাবুন, আপনার ফোনের স্ক্রিনে আজ যা আছে, তা শুধু আপনার নয়। একটি শেয়ার, একটি কমেন্ট বা একটি ভিডিও— প্রথমে এগুলো খুব ছোটো মনে হয়, প্রায় অচেনা একটি কাজের মতো। কিন্তু ধীরে ধীরে বোঝা যায়, এই ছোটো ছোটো কাজগুলোই কোথাও না কোথাও একজন মানুষের দিন বদলে দিতে পারে, কখনো কখনো তার জীবনও।

আজকে ভাইরাল হওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম, একটি আবেগী ভিডিও বা অর্ধসত্য কোনো তথ্য— সবকিছুই খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই দ্রুততার ভেতরেই হারিয়ে যায় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— আমরা কি একটু ভেবেছি? না ভেবে পোস্ট শেয়ার করলে এর ফলটা কার ওপর গিয়ে পড়তে পারে?

ডিজিটাল নাগরিকত্ব আসলে কোনো কঠিন ধারণা নয়। এটা অনেকটা সেই ছোট্ট মুহূর্তটার মতো, যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন এই তথ্যটা আমি যাচাই করব কি না, এই কথাটা আমি ছড়াব কি না, এই প্রতিক্রিয়াটা কারও ক্ষতি করতে পারে কি না। এই থেমে যাওয়ার অভ্যাসটাই ধীরে ধীরে একজন মানুষকে অন্যদের প্রতি বেশি সংবেদনশীল করে তোলে।

এই অভ্যাস আমরা কেউই জন্ম থেকে পাই না। ধীরে ধীরে শিখি। ভুল করে, দেখে, বুঝে শিখি। প্রযুক্তিও আমাদের সামনে একইভাবে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রযুক্তির গতি যত দ্রুত হয়েছে, আমাদের থেমে ভাবার সময় ততটাই কমে গেছে।

আর এখানেই প্রশ্নটা থেকে যায়। আমরা কি সেই গতির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে মানবিকতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলছি?

শেষ কথা খুব জটিল নয়, বরং খুবই সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ কথাটাই সবচেয়ে ভারী। স্ক্রিনের ওপারে যেটা দেখা যায় না, সেটাই অনেক সময় সবচেয়ে বেশি বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।

পরীক্ষিৎ চৌধুরী: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, "দেশে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী 'গণমাধ্যম কমিশন' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করবে সরকার। তিনি বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠনের আগে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি 'পরামর্শক কমিটি' গঠন করা হবে"।

৩রা মে সকালে রাজধানীর তথ্য ভবন মিলনায়তনে 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'জবাবদিহির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহযাত্রী স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম'। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, 'গণমাধ্যম একটি বিশাল ও জটিল ইকোসিস্টেম। তাই সরকার একা কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় না। আমরা একজন সর্বজনগ্রাহ্য গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞকে সামনে রেখে সব পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শক কমিটি

গঠন করব। এই কমিটির সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতেই একটি স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা হবে। যার মাধ্যমে গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

'অবাধ তথ্য' ও 'অপতথ্য' রোধের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, "তথ্যের অবাধ সরবরাহ এখন আর সমস্যা নয়, বরং তথ্যের সাথে নিজের রঙের মাধুরী মিশিয়ে বা অপতথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও অ্যালগরিদমের এই যুগে অপতথ্য রোধে আমাদের বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা, তবে সেই তথ্য অবশ্যই দায়িত্বশীল ও 'ক্লিন ইনফরমেশন' হতে হবে"।

সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা বিষয়ে মন্ত্রী দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, 'বিনা অপরাধে কোনো সাংবাদিক কারাগারে থাকবে না। নীতিগতভাবে সকল সাংবাদিককে আইনের আওতায় পেশাগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে সরকার। মানহানি মামলাসহ অন্যান্য আইনি জটিলতাগুলো প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় আনা হবে।'

সভায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম। তিনি বলেন, 'সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রেস কাউন্সিলকে আরও কার্যকর করা হচ্ছে'।

তিনি বলেন, 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে স্বাধীনতার সঙ্গে জবাবদিহিরও প্রয়োজন রয়েছে। অধিকারের সাথে কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেক ক্ষেত্রে এখতিয়ার ও সীমাবদ্ধতার

তোয়াক্কা না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়'। সাংবাদিকদের জন্য উচ্চমানের নীতি-নৈতিকতা ও পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য বলেও মনে করেন তিনি।

আলোচনাসভায় আরও বক্তব্য দেন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) সভাপতি ও *মানবজমিন* সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাটকো'র মহাসচিব ও একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও *বণিক বার্তার* সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী এবং ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক মোস্তফা আকমল।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শাহ আলম।

পিআইবি'র মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক কামাল উদ্দিন মজুমদার (সবুজ) এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল বাছির (বাছির জামাল)। এ অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র: বাসস

প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রযাত্রা

মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন

বর্তমান বিশ্বে ডিজিটাল প্রযুক্তি কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জনসেবার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি কিংবা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো এখন প্রতিটি দেশের স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতার ভিত্তি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'Digital Lifelines: Strengthening Resilience in a Connected World', যার বাংলা করা হয়েছে 'ডিজিটাল জীবনধারা: সংযোগে স্থিতি, সহনশীলতায় শক্তি'।

এই প্রতিপাদ্যের মূল বার্তা হলো একটি সংযুক্ত বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু উন্নয়নের সহায়ক নয়; বরং এটি মানুষের জীবন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সচল রাখার অন্যতম নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। বাংলাদেশও সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখে ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সম্প্রসারণ, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, স্মার্ট নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার 'সবার জন্য দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট', 'ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব', 'এআই-চালিত ডাটা সেন্টার' এবং 'বিনিয়োগবান্ধব ডিজিটাল অবকাঠামো' বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের এই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিটিসিএল ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে নতুন গতি

বিটিসিএল ইতোমধ্যে দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন, হাওর-বাঁওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩,০০০ ওয়াই-ফাই হটস্পট স্থাপন, ১,০০০ কিলোমিটার মোবাইল ফাইবারাইজেশন এবং ১২,০০০ GPON সংযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বিমানবন্দর ও ৫টি রেলওয়ে স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা চালু করা হয়েছে। বিমানবন্দরগুলো হলো হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম; কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী; সৈয়দপুর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর; ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং যশোর বিমানবন্দর। এছাড়া কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা; সিলেট রেলওয়ে স্টেশন; চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন এবং ঢাকা এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা চালু হয়েছে।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন চালু করা হবে। পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে MVNO ও কোয়াড-প্লে সেবা চালুর উদ্যোগ দেশের ডিজিটাল সেবাকে আরও বহুমাত্রিক ও আধুনিক করবে।

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে বিটিসিএল ৫এ-রেডি অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, উচ্চগতির IP ব্যাকবোন, আধুনিক ডাটা সেন্টার এবং ইকোনমিক জোনভিত্তিক টেলিকম অবকাঠামো নির্মাণে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। জেলা ও উপজেলা

পর্যায়ে co-location I shared telecom infrastructure গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ, স্থানীয় ISP এবং প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

দীর্ঘমেয়াদে স্মার্ট সিটি নেটওয়ার্ক, গ্রিন ডাটা সেন্টার, ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম, IoT/M2M ইকোসিস্টেম এবং FTTx প্রযুক্তির মাধ্যমে ১০ লাখ পরিবারের ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ দেশের ডিজিটাল সক্ষমতাকে আরও সুসংহত করবে।

টেলিটক: অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সংযোগের বিস্তার

রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণে একটি কৌশলগত রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৯-২০৩০ সালের মধ্যে ১২ হাজার সাইট স্থাপন এবং দেশের ৯০ শতাংশ ভৌগোলিক কভারেজ নিশ্চিত করা হবে।

৭০০ মেগাহার্টজ ও ২৩০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডে ৪জি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইন্টারনেটের গতি ও গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিভাগীয় শহর, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে ধাপে ধাপে ৫জি সেবা চালুর পরিকল্পনা দেশের ডিজিটাল সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি গ্রাহক অর্জনের লক্ষ্যে টেলিটক নতুন সিম ক্যাম্পেইন, উদ্ভাবনী ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে কাজ করছে। টেলি-পে মোবাইল অ্যাপ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সরকারি ফি, ইউটিলিটি বিল এবং অন্যান্য ডিজিটাল লেনদেনকে আরও সহজ ও দ্রুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা নগদবিহীন ডিজিটাল অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর নীতি, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি

দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের নীতি বাস্তবায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়নে সহায়তা, অবকাঠামো পরিকল্পনা, নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং AI ও উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করছে। একই সঙ্গে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্থানীয় প্রযুক্তি উৎপাদন সহায়তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি আধুনিক, নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিএসসিএল ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি: সংযোগের নতুন দিগন্ত

বাংলাদেশের ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের টেলিভিশন সম্প্রচার, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট, ডিটিএইচ সেবা, ভিস্যাট কানেক্টিভিটি এবং মোবাইল ও ডেটা সংযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে স্যাটেলাইট সেবা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বিএসসিএল ভবিষ্যতে নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, লো-অরবিট স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণ, AIS প্রযুক্তি ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল সম্প্রচার সেবা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে দেশের ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব আরও শক্তিশালী হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি আরও সম্প্রসারিত হবে।

ডিজিটাল সহনশীলতা সময়ের অপরিহার্য চাহিদা

বর্তমান বিশ্বে ডিজিটাল সংযোগ শুধু উন্নয়নের পূর্বশর্ত নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক সহনশীলতারও অন্যতম ভিত্তি। দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, জরুরি যোগাযোগ, অনলাইন শিক্ষা, টেলিমেডিসিন ও ডিজিটাল আর্থিক সেবার বিস্তারে নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তবে প্রযুক্তির সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে হলে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে হবে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের কাছে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, IoT এবং ডাটানির্ভর অর্থনীতির যুগে টেকসই উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো অপরিহার্য

ডিজিটাল জীবনধারা সংযোগে স্থিতি, সহনশীলতায় শক্তি

এবারের প্রতিপাদ্য আমাদের সেই বার্তাই দেয় যে, প্রযুক্তিই হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সহনশীলতা, উদ্ভাবন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী, স্মার্ট, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই ডিজিটাল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে আরও দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।

মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন: জনসংযোগ কর্মকর্তা

কাজী নজরুল: জনতার সরণি থেকে মধ্যবিত্তের প্রেম-দ্রোহ-উচ্ছলতায়

আবদুল্লাহ আল-আমিন

রবীন্দ্রনাথ তখন অনন্যতায় ভাস্বর, জ্বলে উঠেছেন সহস্র সূর্যের আলো আর উত্তাপ নিয়ে। সেই আলো আর উত্তাপের মধ্যে বসন্তের মত্ততা নিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর আগমনে বাংলা সাহিত্যের গুলবাগিচা ভরে উঠল আনন্দ-হিল্লোলে, কাব্যমালঞ্চ পরিণত হলো ফুলের জলসায়। তাঁর নিপুণ আঙুলের ছোয়ায় হারমোনিয়াম থেকে বেরিয়ে এলো নতুন নতুন সুর, আর সেই সুরের আবেশে মুখর হয়ে বাংলার 'মধুবনের শ্যামা-কোয়েলা' গেয়ে উঠল ইরানি গজল। চম্পাকুঞ্জে কুহরিল পাপিয়া, কাননে কাঁদল কোয়েলিয়া। বাঙালি তাপিত-মথিত হলো, তার বুকের মধ্যে জেগে উঠল এক নতুন স্বপ্ন, নতুন স্পন্দন। নতুনের জয়গানে নির্ঘোষ গর্জনে তিনি যখন উচ্চারণ করেন: 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর/ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখী ঝড়', তখন বঙ্গদেশের 'যৌবনের টিকা-পরা' তরুণ দল মিথ্যা-মৃত্যু, জীর্ণ-পুরাতনকে প্রবলভাবে প্রত্যাখান করে জীবনের উল্লাসে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। ব্যক্তি ও কবি নজরুল ছিলেন একাধারে দিলদরিয়া, প্রাণবন্ত ও প্রতিভাধর। তারপরও বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তিনি ছিলেন একা, সম্পূর্ণরূপে একা।

রবীন্দ্র প্রভাব বলয় থেকে অনেকেই সরে এসেছিলেন, কিন্তু এই সরে আসা মানুষদের মধ্যে প্রথম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যেমন সুর-স্বর ও প্রকাশভঙ্গিতে, তেমন পোশাক-আশাকের উজ্জ্বলতা-উচ্ছলতায়। তাঁর শরীরজুড়ে ছিল কবিতার সমারোহ, যেন বিহ্বল ও বর্ণাঢ্য কবিতার উচ্ছ্বাস। গায়ে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি, কাঁধে গেরুয়া উত্তরীয়। মুখে প্রসাধনের গাঢ় ছাপ। বিস্তীর্ণ জনসমাগমের মধ্যেও খুব অনায়াসে তাঁকে চিহ্নিত করা যেত। জমকালো পোশাক পরে তিনি না কি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইতেন। সব সময় উচ্চরোলে হাসতেন, ফেটে পড়তেন উৎসাহের উচ্ছলতায়। বড়ো বড়ো টানা চোখ, মুখে পৌরুষের বলিষ্ঠতার সঙ্গে গভীর কমনীয়তা। অসুস্থ হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাপন করে গেছেন এক বর্ণাঢ্য জীবন। ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী ও স্টাইলিশ। প্রতিভা বসুর (রানু সোম) কথা ধার করে বলতে হয়, 'বাঙালির তুলনায় একটু বেশিই স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী' ছিলেন যেন রূপকথার নায়ক। রানু সোম তাঁর *জীবনের জলছবি* বইতে ত্রিশ বছরের নজরুলের চেহারা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'যৌবন তাঁর চোখে-মুখে, সারাক্ষণ হাসিতে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোত বহমান, বেগবান। সেই বয়সে যারা তাঁকে দেখেছেন শুধু তাদেরই বোঝানো যাবে কী দুকূলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। মস্ত বড়ো বড়ো টানা চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাবরি, তীক্ষ্ণ নাসিকা, ঘষা তামার মতো

রং, সরলসহজ অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাস প্রবণতা, সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব বটে।' কিংবদন্তির নায়ক বলতে যা বোঝায়, আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন তাই। গান, গজল, শ্যামা সংগীত আর বিপ্লবী কবিতা দিয়ে সারাদেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন। এর ফলস্বরূপ, যৌবনেই লাভ করেন হাজার হাজার ভক্ত-অনুগামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তাঁর গান-কবিতা শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসত অসংখ্য রসপিপাসু মানুষ। যার গলায় সুর নেই, তার মুখেও শোনা যেত– 'কে বিদেশি মন উদাসী, বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।' সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, '১৯৩০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল।' (*বাংলা গানের সন্ধানে*, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৭৯) রসবোধসম্পন্ন, আড্ডাবাজ ও মজলিশি স্বভাবের মানুষ ছিলেন বলেই অসংখ্য বন্ধু পেয়েছিলেন জীবনের নানা পর্বে। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো খুব অনায়াসেই মানুষকে কাছে টানতে পারতেন। তাঁর বাঁশির সুর শুনলে কেউ ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজনও তাঁর মতো সক্রিয়, সচেতন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল না।

যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিনও হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ পিজি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ছুটে আসে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। বিপুল জনসমাগম হয় চারুকলা চত্বর, রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। শামসুর রাহমান লিখেছেন, 'তাঁর সান্নিধ্যে ছুটে এসেছিল হাজার হাজার লোক। সারা ঢাকা বেরিয়ে এসেছিল রৌদ্রজ্বলা দুপুরে, ছায়াচ্ছন্ন বিকেলে। জীবনে যিনি আকর্ষণ করতে পারতেন, মরণেও তিনি নিজের কাছে টেনে আনলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে। সূর্য যখন কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায়, রমনার ঘাসে, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক লাইব্রেরির দেয়ালে জাফরানি রোদ ঝরিয়ে এলিয়ে পড়ছিল পশ্চিম দিকে, তখন তাঁকে, কাজী নজরুল ইসলামকে, নামানো হলো কবরে।' ('গোধূলির বন্দী এখন মুক্ত আকাশে', *একান্ত ভাবনা*, ২০০১) নজরুলের চিরবিদায়ে মহানগরী ঢাকা গাঢ় বেদনায় কেঁদে ওঠে, কেঁপে কেঁপে ওঠে সমগ্র বাংলাদেশ।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবস্থান এবং তাঁর কবিতা ও প্রতিভা নিয়ে যেমন প্রচুর বিতর্ক আছে, তেমনি রয়েছে বিহ্বলতা। প্রবল ঝড়ের মতো তিনি লিখতে পারতেন, সেই ঝড়ের বেগ তাঁকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। ভালো কবিতার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির দীপায়ন, পরিমার্জনা, ভাবের উদ্দামতাকে সংহতকরণ, সংযমতা ও সৌন্দর্যচেতনা। কিন্তু ওসবের ধার ধারতেন না। কলমে যা আসত, তা-ই নির্দ্বিধায় লিখে যেতেন। বুদ্ধির চেয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস, প্রেম-আনন্দকে গুরুত্ব দিতেন বেশি। বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে চড়া গলার কবি হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, তাঁর কাব্যে হইচই অত্যন্ত বেশি, আর একারণে তিনি জনপ্রিয়। যেখানে ভালো লিখেছেন, সেখানে তিনি হইচইটাকেই কাব্যমণ্ডিত করেছেন, কোলাহলকে বেঁধেছেন গানের সুর-লয়ে। তাঁর সব লেখার মধ্যে যে এক ধরনের অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা ও গতিশীলতা রয়েছে, সেটা বুদ্ধদেব বসু অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর 'বিদ্রোহী' পড়তে গেলে, মনের ভেতর এক ধরনের স্ফূর্তি জেগে ওঠে। দেহমন কেঁপে ওঠে, শিহরিত হয়। কবিতাটিতে তিনি তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ, দুর্বিনয়, অভিমান এমনকি ইনফেরিয়োরিটি কমপ্লেক্স থেকে উদ্ভূত সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা অতুলনীয়। এ কবিতাতেই তিনি জানান দেন, যে-কোনো ক্ষমতাবানের ক্ষমতার অপ্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সবার হয়ে উঠলেন, হয়ে উঠলেন জনতার কবি। সুবোধ সরকার লিখেছেন, "গুলি চলেছিল কৃষ্ণনগরে। শহিদ হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। স্কুলে স্কুলে, ঘরে ঘরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখে তখন শোনা গিয়েছিল 'বিদ্রোহী'। আবার নকশাল আন্দোলন নেমে এলো আমাদের পাড়ায় পাড়ায়, তখন দেখেছি কবিতাটি নতুন করে লেখা হলো, তাঁর একটি শব্দও পাল্টালো না, কিন্তু নতুন মনে হল।" (সুবোধ সরকার: 'একটি উপমহাদেশ, একটি কবিতা', *দেশ*, ১৭ই জুলাই ২০২২) তাঁর কবিতার মান নিয়ে সাহিত্যবোদ্ধারা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার চমৎকারিত্ব ও পাঠকপ্রিয়তা নিয়ে আঙুল তুলতে পারেননি। বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীরা মনোবল বাড়াতে 'বিদ্রোহী' কবিতা জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন। গত শতাব্দীতে এই কবিতা না পড়ে কেউ বিপ্লবী হতে পারেনি।

নজরুল জনজীবন থেকে উঠে এসেছিলেন, পারতেন জনগণের ভাষায় লিখতে। পারতেন সাধারণ মানুষকে দ্রুত সম্মোহিত করতে। এজন্যই জনসাধারণ তাঁকে তাদের নিজেদের কবি বলে মনে করেছে। নজরুল ভক্তরা তাঁর নামের আগে নানা অভিধা ও বিশেষণ জুড়ে দিয়েছে, যেমন: সাধক কবি, শাক্তপদাবলির কবি, বৈষ্ণব কবি, প্রভাতী কবি, যৌবনের কবি, বিদ্রোহী কবি, ভাঙা-গড়ার কবি, প্রেমিক কবি, গানের কবি ইত্যাদি। তবে 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। কারণ 'বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে' নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতা-গানে কেবলই দ্রোহ নেই; মাটির পৃথিবীর গন্ধও রয়েছে, তাই বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছেন, তাঁর কবিতা 'খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে'। তিনি জনগণের নার্ভ বুঝতেন বলেই তাঁর কবিতা মাটিবর্তী হতে পেরেছে। আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছিলেন, 'জনগণের নাড়ি কোনখান দিয়ে বয়, সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অব্যর্থ।' বাঙালির জীবনবোধ– তার ভাবুকতা, প্রেম ও দ্রোহকে তিনি খুব কাছে থেকে চিনেছিলেন এবং বুঝেছিলেন। জনসম্পৃক্তির কারণে আম-বাঙালির ভাবাবেগ, চৈতন্য, মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে কখনও কবি হিসেবে, কখনও ভাবুক-সাধক হিসেবে তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্যের ধার করা চশমা পরে, মায়াবী টেবিলে বসে তিনি কবিতা রচনা করেননি। তাঁর কবিতার ভাঁজে ভাঁজে প্রবলভাবে জেগে থাকে সহজ ও সহজিয়াদের আবেগের বিহ্বলতা, ব্যথাতুর লড়াকু জনতার আবেগদীপ্ত চেতনার গর্জন ও আর্তনাদ। বহুদর্শী ও বিচিত্রগামী নজরুল ছিলেন এক অজ গ্রামের গরিবের ছেলে, ঘুরে বেড়িয়েছেন

মাঠঘাটে, দূর-দূরান্তের গ্রামগঞ্জে। অল্প বয়সে যোগ দেন লেটোগানের দলে। লেটোর দলে দোহার হয়ে গান করেছেন, এক পর্যায়ে লেটোগানের রচয়িতা হয়ে ওঠেন। মিষ্টি গলার অধিকারী ছিলেন তিনি, সেই সঙ্গে ছিল সহজাত সংগীত প্রতিভা। অল্পদিনের মধ্যে হয়ে ওঠেন লেটোদলের 'ছোট ওস্তাদজি'। লেটোদলে সম্পৃক্তির কল্যাণে রপ্ত করতে সক্ষম হন *রামায়ণ-মহাভারতের* খুঁটিনাটি বিষয় এবং মুসলমান *ধর্মের হাদিস-কোরানের* ব্যাখ্যা। সেই সঙ্গে আয়ত্ত করে নেন লেটোগানের স্বাভাবিক ছন্দবোধ, সুর-তালের জ্ঞান ও নাচের মুদ্রা। এভাবেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিতে থাকে কবিত্ববোধ। অল্প বয়সেই লেটোদলে বেঁধে ফেলেন 'চাষার সঙ', 'শকুনীবধ', 'রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ', 'দাতা কর্ণ', 'রাজপুত্রের গান', 'আকবর বাদশাহ', 'কবি কালিদাস', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'মেঘনাদ বধে'র মতো লেটোগানের পালা। জীবন-জীবিকার সূত্রে যুক্ত হন বাবুর্চিগিরি ও রুটির দোকানে ময়দা মাখা, রুটি তৈরি, রুটি সেঁকা ও তা বিক্রির কাজের সঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে করাচি গিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন নানা ধরনের গল্প। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন সেখানে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাঁর সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। একদিকে মাজার-মক্তব জীবন, অন্যদিকে লেটোদল ও সৈনিকজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে বাংলা, বাঙালি তথা ভারতবর্ষীয় জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে। দারুণ আবেগী, সংবেদনশীল ও অভিমানী ছিলেন তিনি। আপনজনদের অবহেলা-উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তাঁকে অভিমানী, ক্ষুব্ধ করে তোলে। বুকভাঙা অভিমানে *মহাভারতের* কর্ণ যেমন আত্মত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, স্নেহের কাঙাল, অভিমান-আহত নজরুলও তেমনি চিরদিনের জন্য গ্রাম-পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সত্যি বলতে কী, তিনি ছিলেন অবহেলিত, নিষ্পেষিত গোত্রের মানুষ। অন্যদিকে, বাংলা ভাষার কবিরা বিশেষত, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তিরিশের কবিরা ছিলেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি। তিরিশের কবিরা ছিলেন আপাদমস্তক পাশ্চাত্য চিন্তায় আচ্ছন্ন। নজরুল ছিলেন তাঁদের থেকে ভিন্ন প্রেক্ষাপট, আলাদা ধাঁচের মানুষ। তাই তিরিশি কবিদের কাব্যরুচির নিক্তি দিয়ে নজরুলকে মাপলে ভুল হবে। তবে এ কথা ঠিক যে, তিরিশি কবিরা যতই আধুনিকতাবাদে আচ্ছন্ন থাকুন আর নজরুল সম্পর্কে যত কথাই বলুন না কেন, বাঙালির জনমন ও জনসংস্কৃতিতে নজরুলের দাপট ও ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেননি। কল্লোল যুগ পড়লে বোঝা যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, দীনেশ সেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ নজরুল সম্পর্কে কতটা আগ্রহী ও কৌতূহলী ছিলেন। রবীন্দ্রবিরোধী লেখকরাও তাঁকে সাদরে বরণ করেছেন।

নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনে যত প্রশস্তি ও প্রশংসা পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যিকের ভাগ্যে জুটেছে কি না তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘেঁটে হিসাব করে দেখতে হবে। *মোসলেম ভারত* প্রকাশিত নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন: 'বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।... আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙলার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি..।' শুধু মোহিতলাল মজুমদার নয়, নজরুলের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। নজরুলকে জড়িয়ে ধরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তুমি ভাই, নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা তো নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।' গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও নজরুলের আবির্ভাব টের পান *ধূমকেতুর* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধূমকেতু' কবিতা পড়ে। এ কবিতায় নজরুল লেখেন, 'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ/ মহাবিপ্লব হেতু/ এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।/ সাত-সাত'শ নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে!/ মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ললাটে।' *ধূমকেতু* পত্রিকা ছিল নজরুলের নিজ উদ্যোগে প্রকাশিত এক অনবদ্য সাহিত্য পত্রিকা। এ পত্রিকার জন্য নজরুলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু!/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,/ দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে/ উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!' আঁধারে অগ্নিসেতু বাঁধা এবং দুর্দিনের দুর্গশিরে বিজয় কেতন ওড়ানোর কাজটি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিপর্যস্ত ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে সহজসাধ্য ছিল না। দেশের মানুষকে মুক্ত করতে নানাজন নানাভাবে কাজ করেছেন। বাংলার কবিরা দেশ জননীর শৃঙ্খল মোচনের জন্য হাজির করেছেন নানা কবিতা ও গান। নজরুলও দেশমাতার মুক্তি ও অর্ধচেতনদের জাগাতে গিয়ে রচনা করেন 'আনন্দময়ীর আগমনে'। এই কবিতার জন্য তাঁকে কারাপ্রকোষ্ঠে অন্তরিন হতে হয়। অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি রাজবন্দি 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু' কে উৎসর্গ করেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, নজরুলের হাতে ছিল বিষের বাঁশি। যে বিষ পান করতে করতে তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে নানামুখী আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দেশের দেশপ্রেমিক জনগণ যখন বিচলিত, বিভ্রান্ত, পীড়িত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনও তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতো জাগ্রত ছিলেন। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ কারাগার হয়ে উঠেছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড়ো বড়ো নেতারা যখন একের পর এক স্বেচ্ছানির্বাসন কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধহীন নিষ্ক্রিয়তার পথ বেছে নিচ্ছেন, তখনও তিনি গর্জে উঠেছিলেন কবিতা ও গানের হাতিয়ার নিয়ে। তাঁর কবিতার দৃপ্ত উচ্চারণ ও গানের সৌরভ তখন বাঙালির অন্দর-অন্তর থেকে রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির প্রাণের কবি। ব্যক্তি ও কবি হিসেবে নজরুল ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। কবি ও সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী যথার্থই বলেছেন, 'অন্যেরা যেখানে শুধুই কবি, তিনি সেখানে তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মহত্তর এক ব্যক্তি, তিনি ইতিহাসের স্রষ্টা এবং ইতিহাসের এক পর্বের একজন নায়ক।

সমকালকে এভাবে আলোড়িত অভিভূত আর কোনও কবি করেনি।' নজরুল তাঁর গান-কবিতা দিয়ে জীবনে জীবন যোগ করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন মানুষে মানুষে আত্মীয়তা, আঘাত করেছেন সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার দুর্ভেদ্য দুর্গে। বাংলার কাব্যকুঞ্জ তাঁর চেতনার রঙে রঙিন হয়েছে। তিনি বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়েছেন, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করেছেন। তাঁর গান-কবিতা-প্রবন্ধ বিভ্রান্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করে রাজপথে নামিয়ে এনেছে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, রাজপথে, সভায় এ কবিতা (বিদ্রোহী) নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত পাঠক পড়েছে।' বাঙালির তেজ, চৈতন্য, আকাঙ্ক্ষা নজরুলের কবিতায় মূর্ত হয়েছিল বলেই কলকাতার আলবার্ট হলে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি।'

সাহিত্যচর্চা ও পত্রিকার সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, একে ফজলুল হক, মুজফফর আহমদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বারীন ঘোষের মতো খ্যাতিমানদের সঙ্গে। দেশবন্ধু সি আর দাশের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁরা দু-একজন ছাড়া সবাই ছিলেন অমুসলমান। তাঁর গানের সমঝদার এবং শ্রোতারাও ছিলেন অমুসলমান। যেসব পরিবার থেকে তিনি গান শোনাবার আমন্ত্রণ পেতেন, সেগুলো অমুসলমানদের পরিবার। তখনকার নামকরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় ওরফে মন্টু ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজন। দিলীপকুমার লিখেছেন, 'কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ করে এসেছি অনুজের মতো। সেও আমাকে বার বার অগ্রজের মতনই মান দিত, ভালোবাসত।' সভায় বা আসরে দিলীপকুমারকে দেখলেই দৌড়ে গিয়ে অট্টহাস্যে ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দুলিয়ে জড়িয়ে ধরতেন 'দিলীপদা' বলে। দিলীপ রায় লিখেছেন, 'এক সময়ে আমি তাঁর নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, এত জল ও কাজল চোখে... প্রভৃতি।' (উদ্ধৃত: প্রীতম সেনগুপ্ত, 'পরিশীলিত সুররসিক', *দেশ*, নভেম্বর ২০২২) দিলীপকুমার রায়ের মাধ্যমেই ঢাকার রানু সোম ওরফে প্রতিভা বসুর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। রানু সোমকে তিনি তাঁর সমস্ত গান উজাড় করে শিখিয়েছিলেন। ১৯২০-১৯২১ সাল থেকে নজরুলের কুমিল্লায় যাতায়াত ছিল। কুমিল্লার মহেশপ্রাঙ্গণে কবি গানের আসর বসাতেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী লিখছেন, 'কবি ঈশ্বর পাঠশালার তদানীন্তন শিক্ষক ধীরেন সেনের বাড়িতে থাকতেন। সেখানে তাঁর (নজরুল) সঙ্গে দেখা হল। তিনি হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাচ্ছেন: 'ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।' তিনি সেসময় নিজের গানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানই বেশি গাইতেন। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলতেন। কবি শেখর হাফিজের ভক্তও তিনি ছিলেন।' (*কাজী নজরুল ইসলাম*, *সংস্কৃতি কথা*, পৃ. ১৪৫)

কলকাতার ইউনিভার্সিটি, ইনস্টিটিউট, রামমোহন লাইব্রেরি বা মার্কাস স্কোয়ার যেখানেই গানের আসর বসত সেখানেই নজরুল হাজির হতেন। *বিশ্বভারতীর* সহ-সম্পাদক হরিহর চন্দ্রের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের অফিসে সভা বসেছে। কয়েকজন সুন্দরী উপস্থিত হয়েছেন। গান হচ্ছে মধুরকণ্ঠে। বাহারি পোশাকে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন নজরুল। আর যায় কোথায়, হারমোনিয়াম টেনে নিলেন নজরুল। নারীদের উদ্দেশে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আপনারা সুর, আমি অসুর।' অসুরের সুরে ঘর ভরে উঠল। গানের আমন্ত্রণ (১৯২৮) পেয়েছেন বুড়িগঙ্গা তীরের জমিদার রূপবাবুর কাছ থেকে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িসহ বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তরুণ বয়সে বুদ্ধদেব বসু ঢাকার পুরানা পল্টনের যে টিনের ছাপড়ায় থাকতেন, সেখানেও তিনি গেছেন। অশোক লেনের অজিত দত্তের বাড়িতেও তিনি গিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গার কংগ্রেস নেতা হর্ষপ্রিয় বিশ্বাসের (খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত) বাড়িতেও সপরিবার অবস্থান করেছেন দিনের পর দিন। হেমন্তকুমার সরকারের কৃষ্ণনগরের বাড়িতেও বসবাস করেছেন। নানা জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গসুধা পেয়ে তাঁর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা দৃঢ়মূল হয়। কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী আশালতা সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রেম-বিবাহ তাঁকে সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানুষে রূপান্তরিত করে। হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যের মিলনসাধনার ব্রত তিনি সারাজীবন পালন করে গেছেন। প্রচলিত ধর্মের নীরস তত্ত্বকথার চেয়ে জীবনের উচ্ছলতাকে তিনি বড়ো করে দেখেছেন। হয়ত অনেকেই এটা ভালো চোখে দেখেননি। তবুও নির্বাক হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের সার্বক্ষণিক সক্রিয় অ্যাক্টিভিস্ট। সংগীতচর্চা ও পত্রিকা সম্পাদনা তাঁকে হিন্দু-মুসলমানের কাছে টেনে আনে। তিনি নিজেও চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে। *নবযুগের* সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন,

> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। (*নবযুগ*, *যুগবাণী*, *নজরুল রচনাবলী* ১, পৃষ্ঠা: ৮১১)

আর একটি সম্পাদকীয়তে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে তাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও হিন্দুদের ছুঁৎমার্গকে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি চাননি হিন্দু-মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করুক কিংবা মুসলমান হিন্দু আচার অনুসরণ করুক। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

> হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া... মানব!... তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, 'আমার মানুষ ধর্ম।'

ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রধান বিষয় ছিল মানুষ ও মানবিকতা, নজরুলও তাঁর প্রেমিক হৃদয় দিয়ে মানুষকে বড়ো ও মহান করে দেখেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও ধর্মান্ধতাকে ডিঙিয়ে বাঙালি তার নিজের শক্তিতে, নিজের আত্মপরিচয়ে বড়ো হয়ে উঠুক। তিনি কেবল দ্রোহ ও ভাঙার কবি নন, তিনি মিলন-সম্প্রীতি ও প্রেমের কবি। ভাঙাগড়া, উত্থান-পতন ও দোলাচলের মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। তিনি দেবতা কিংবা অসুরের উদ্দেশে কোনো স্তোত্র পাঠ করতে চাননি, তিনি কেবল মানবের জয়গান করেছেন।

নাই দানব/ নাই অসুর-/ চাইনে সুর,/ চাই মানব।

কবিতার শেষ স্তবকে গেয়েছেন:

ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক।/ মা'র আবাহন-গীত চলুক!/
দীপ জ্বলুক!/ গীত চলুক!!

নজরুল মুসলমান ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন, কিন্তু হিন্দু ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়েছিলেন। এজন্যই পশ্চিমবঙ্গের নজরুল গবেষক শেখ মকবুল ইসলাম বলেছেন, 'নজরুল বাঙালি সংস্কৃতির স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিজীবনে তিনিও হিন্দুমতে সাধনা করে সাংস্কৃতিক সমন্বয় চেতনার উজ্জ্বল প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।' (*নজরুল নানা মাত্রা*, কলকাতা, ২০১২) 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহের ধূপকাঠিতে', 'আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি'– এর মতো কালজয়ী ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন। কবি সারাজীবন দেশজননীকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সাধক কবি ছিলেন, তাই মাতৃভক্ত সাধকের মতো এসব সাধন সংগীত রচনা করতে পেরেছিলেন। শাক্ত পদাবলির পাশাপাশি 'সখী সে হরি কেমন বল', ' ব্রজ গোপী খেলে হরি'র মতো বৈষ্ণব পদাবলিও রচনা করেছেন। ভাঙা-গড়া ও বিভেদের মধ্যেও তিনি সবাইকে নিয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, তাই তখনকার বাঙালি সারস্বত সমাজ তাঁকে উপেক্ষা করতে পারেনি। সুভাষ বসু বলেছিলেন, 'নজরুল আমাদের জাতীয় জীবনের সবখানে আছেন। প্রেম, দ্রোহ, কারাগার– সবখানেই' তিনি। কেবল প্রেম, দ্রোহ, মানবিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নয়, শ্লেষে, ব্যঙ্গে, কৌতুকেও তিনি ছিলেন। সরল-সহজ ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেও বাংলা কবিতার সুবর্ণ ভাণ্ডারকে ভরিয়ে দিয়েছেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজ ইংরেজ আমলের নতুন শিক্ষাকে সন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেও শিল্প-সাহিত্য বিশেষত সংগীতকে উদারচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের কাছে গানবাজনা ছিল একটি নিষিদ্ধ বিষয়। 'বাঙালি মুসলমান সমাজে সংগীত হারাম না হলেও মাকরুহ ছিল'। নজরুলের মাধ্যমেই বাঙালি মুসলমান গান-কবিতা তথা সাহিত্য ভালোবাসতে শেখে। নজরুলের আবির্ভাবে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে বাঙালি মুসলমানের চিত্তকানন। তারা বুঝতে শেখে, পরাজয়ের বিষাদের ছায়ায় নিজেদের নিমজ্জিত রেখে, প্রতিবেশীর ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার বর্জন করে, অনুভূতি কল্পনা আনন্দ প্রেমকে অস্বীকার করে খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আরও বুঝতে পারে, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিয়েছেন, 'মুসলমান বাঙালি'কে তিনি 'বাঙালি মুসলমানে' রূপান্তরিত করতে পালন করেছেন যুগান্তকারী ভূমিকা। ঐতিহাসিক ভ্রান্তি, হীনম্মন্যতা ও সংস্কারজনিত কারণে

যে-বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সাহিত্য ও সংগীত থেকে দূরে থেকেছে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংগীতানুরাগী হয়ে ওঠে, প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঈদবিষয়ক সাহিত্যে সাময়িকী প্রকাশনার। ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনের যে গান লাগে সেটাও আমরা নজরুলের মাধ্যমেই শিখেছি। তার ইসলামি গান বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এসব গানে আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা গানের ভুবনকে আক্ষরিক অর্থেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলেন। তাঁর হামদ নাতসহ ইসলামি গানগুলো এত সজীব, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী যে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সর্বস্তরের শ্রোতাই এর বাণী ও সুরে আপ্লুত ও আলোড়িত হয়। 'মসজিদেরই পাশে আমায়, কবর দিও ভাই/ যেন গোরে থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'– গানটি এত সরল ও মর্মভেদী যে, এই একটি গানের জন্য কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রশংসাসূচক গান- হামদ এবং ইসলামের নবি মুহাম্মদ (সা.)– এর প্রতি ভক্তিমূলক অনেক গান তিনি রচনা করেছেন। 'চক্ষে আমার কা'বার ছবি বক্ষে মহাম্মদ', 'হেরা হতে হেলেদুলে, নুরানি তনুর', 'আমিনা দুলাল নাচে, হালিমার কোলে' ইত্যাদি গানগুলো যেন বাঙালি মুসলমান হৃদয়ে তৃষ্ণা নিবারণের শরাবের মতো। শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের অনুরোধে রচনা করেন, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, এলো খুশীর ঈদ' এর মতো কালজয়ী গান, যে গান আজও বাংলা সংগীত ভুবনে চিরসবুজ, চিরঅম্লান, চির অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একুশ শতকেও তাঁর গান ছাড়া বাঙালি মুসলমানের ঈদের আনন্দ পূর্ণতা পায় না, তাঁর নাতে রসুল ছাড়া মিলাদ-মাহফিল জমজমাট হয় না। বাঙালির চিন্তাজগতে নজরুলের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য, সেই প্রভাব দিয়ে গানবাজনা ও সাহিত্যচর্চা সর্বজনের মাঝে ছড়িয়ে দেন। সেই সঙ্গে সবাইকে বুঝিয়ে দেন, বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। তিনি বাঙালির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বসন্তের মত্ততা এনেছিলেন। তাই মোতাহের হোসেন চৌধুরী নজরুলকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, 'সংস্কৃতির শীতের দেশে হঠাৎ এলেন নজরুল ইসলাম বসন্তের মত্ততার মতো। তাঁর আগমনের সঙ্গে রিনেসাঁসের আর্বিভাব হলো– বুদ্ধি কল্পনার দ্বার খুলে গিয়ে মানবমহিমা উপলব্ধ হলো।' (*নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস*, *সংস্কৃতি-কথা*, পৃষ্ঠা: ১৬৯) আসলেই তিনি বাঙালির নীরস প্রাণহীন জীবনে বয়ে আনেন বসন্তের আনন্দ-হিল্লোল। বেঁচে থাকার স্বাদ, জীবনকে প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে উপভোগ করার মন্ত্র আমরা নজরুলের সাহিত্যপাঠ করেই জেনেছি। 'খোশ আমদেদ' নামে একটি গান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত (২৭.০২. ১৯২৭) মুসলিম সাহিত্য সমাজ– এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গীত হয়: 'দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি!/ শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি।।/ তালি বন ঝুমকি বাজায় গা 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা।/উলসি' উপচে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি।' কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এই গান শুনে সুরের বিপুল উচ্ছ্বাসে সুধীগণ এমনকি মোল্লা-মৌলবীগণ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠবেন।' তাদের কথা, 'কী সুন্দর ইসলামী গান, ঠিক যেন গজল।' তাঁর কবিতা-গানে রয়েছে আরবি-ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি। যদিও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানুষ। গজল রচনার মাধ্যমে সংগীতভুবনে তাঁর প্রবেশ, গজল নজরুলকে বাংলার জনমানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় জায়গা করে দেয়। কত যে ব্যতিক্রমী ও অভিনব সুর ও স্বাদের গান তিনি রচনা করেছেন যার হিসাব মিলানো ভার। ঝুমুর, ভাটিয়ালি, শ্যামাসংগীত, আরবি সংগীত, হামদ-নাত কি নেই সেই তালিকায়। জাগরণীমূলক কোরাস গান রচনায় তিনি ছিলেন অনন্য। 'কারার ঐ লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।','শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' প্রভৃতি নতুন ধাঁচের গান রচনা করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশাত্মবোধক ও জাগরণীমূলক গান এবং মার্চ সংগীতও তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়– বাংলা ভাষার অন্দরে ঢুকিয়ে দিয়েছে গতি, শক্তি ও সংগ্রামশীলতা। মুজফফর আহমদ যথার্থই লিখেছেন, 'আমাদের ভাষায় জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা স্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানিতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আমরা বুঝেছি যে, বাঙলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী।' বুকের ভেতর জমাটবাঁধা বেদনা, ক্রোধ, ক্ষোভ, সাহসকে তিনি কখনও গান-কবিতায়, কখনও প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পত্রসাহিত্য ও প্রবন্ধেও কবিতার তেজ ও তাপ খুঁজে পাওয়া যায়। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি পড়তে গেলে মনে হয় 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি পড়ছি। গীতিকাব্যধর্মী নতনম্র বাংলা ভাষার শরীরে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন তেজ, দীপ্তি ও আগুন। তাঁর চঞ্চল পদচারণায় সাহসী ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িকতা-আধিপত্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদক্লিষ্ট বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ। তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতায় রচিত হয়েছে এক নতুন শিল্পভাষা, গড়ে উঠেছে বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতির নতুন ভূগোল।

তথ্য নির্দেশ

১। গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৮

২। শেখ মকবুল হোসেন, *নজরুল নানা মাত্রা*, কলকাতা ২০১২

৩। কাজী মোতাহার হোসেন, *স্মৃতিচিত্র*, কলকাতা, ১৯৯১

৪। রফিকুল ইসলাম, '*কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি*' ঢাকা, ১৯৯৭

৫। প্রতিভা বসু, *জীবনের জলছবি*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০

৬। মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস*, *সংস্কৃতি-কথা*

৭। সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের সন্ধানে*, কলকাতা, ১৯৯০

৮। *দেশ*, ১৭ জুলাই ২০২২; ২ নভেম্বর; ২ জুলাই ২০২৪

আবদুল্লাহ আল-আমিন: অধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর

দুই বাংলায় দুই রবীন্দ্রনাথের সুলুক সন্ধান

ড. কুদরত-ই-হুদা

ভাষা আর জাতিগত মিলের কারণে বর্তমান বাংলাদেশ আর বর্তমান ভারতের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বরাবরই একটা ঐক্য অনুভব করে থাকে। দুই দেশের বাংলাভাষী মানুষেরা বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের ভাবসম্পদকে তাদের নিজেদের ভাবসম্পদ বলে মনে করে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-কে বাংলাভাষী বাংলাদেশ আর ভারতের মানুষেরা তাদের নিজের বলে মনে করে। এজন্য তারা রাষ্ট্রের অনুমতির অপেক্ষা আগেও করেনি, এখনো করে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুই কবি, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে পড়া এবং গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দুই বাংলায় একটা পার্থক্য আছে। পূর্ব বাংলায়, মানে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে যে-ভাবে, যে-আবেগে, যে-দৃষ্টিকোণে পড়া হয় ও গ্রহণ করা হয় তা ততটা রাজনৈতিক ভারতের অপরাপর বাংলাভাষী অঞ্চলে সে-ভাবে, সে-আবেগে আর সে-দৃষ্টিকোণে পঠিত ও গৃহীত হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের রাষ্ট্রীয় আর জাতিগত প্রয়োজনে যেভাবে ব্যবহার করেছে ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলে সেভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনই পড়েনি বা করেনি। এদিক বিচারে ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলে বরং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-ই বোধ করি এগিয়ে থাকবেন।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে ব্যক্তিগত রুচি ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বলেই মনে হয়। তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, সুশীল ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের রবীন্দ্রনাথই এসময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিত। এককথায় রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে সাহিত্য-সৌন্দর্য উপভোগের আকর ছিল। এই উপভোগ আর আনন্দময় পাঠের মধ্যে আবার ১৯৪৭-এর দেশভাগ বোধ করি বেশ কিছুকাল যাবৎ বাধ সেধেছিল। কারণ মুসলমানত্বের স্বতন্ত্র পরিচয় সেদিন মুখ্য হয়ে উঠেছিল। ফলে, বাঙালি মুসলমান সেদিন নতুন ঘর গোছাতে গিয়ে পুরানো ঘরের অনেক মালপত্র ফেলে আসার উপক্রম করে থাকবে হয়ত।

কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের বিস্মৃতির পর্দা সরে যায়। দেশভাগের পরে প্রায় এক যুগের ব্যবধানে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা আবার রবীন্দ্রনাথকে ঝেড়েপুছে তাদের নতুন ঘরে ওঠানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ, পাকিস্তান রাষ্ট্র তাদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করতে থাকে। একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের বাঁধনে বাঙালিকে বাঁধতে চেষ্টা করে। এসময় পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানরা মুসলমানের চেয়ে আগে বাঙালি হতে চেয়েছিল। তাদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত স্বীকৃতি চেয়েছিল। এই বাঙালি হওয়ার সাধনায় বাঙালির জন্য রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটি বুঝেই বিশ শতকের ষাটের দশকে এসে তৎকালীন পাকিস্তানে সরকারিভাবে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধের ঘোষণা আসে। এই ঘোষণায়

পূর্ব বাংলার বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ আরো জরুরি হয়ে ওঠে। এই সময়ের রবীন্দ্রনাথ আর দেশভাগের আগের রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক নয়। এজন্যেই শুরুতে বলেছিলাম, পশ্চিম বাংলায় বা ভারতের অপরাপর বাংলাভাষী অংশে রবীন্দ্রনাথের পাঠ ও প্রাসঙ্গিকতা, আর পূর্ব বাংলার পাঠ ও প্রাসঙ্গিকতা এক নয়, আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বরাবরই লড়াই-সংগ্রামের হাতিয়ার। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র। নজরুলও তাই।

'আসল কথা পূর্ব বাংলার অধিবাসীবৃন্দের জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের সংগ্রামে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈপ্লবিক উপকরণ হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনাকে আঁচ করেছে প্রথমে বিপক্ষ ঔপনিবেশিক চক্র। তারা হামলা চালিয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির যে-কোন রকমের অভিব্যক্তির উপর।' (রণেশ ২০১৪:৯৫) একারণে বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের কিছুকাল আগে নানা অজুহাতে গ্রেপ্তার হন আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), কে. জি. মোস্তফা (১৯২৮-২০১০) ও আনোয়ার জাহিদ (জ. ১৯৩৮) প্রমুখ সংস্কৃতিসেবীরা। রবীন্দ্রনাথ ও শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কঠোর সমালোচনা করা হয় *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণের চেষ্টা করা হয় নানা লেখার মাধ্যমে। স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-আকাঙ্ক্ষী পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা উদ্‌যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বলেন, এরা পাকিস্তানবিরোধী, জাতীয়তার শত্রু, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার শত্রু, অখণ্ড বাংলা গঠনের পাঁয়তারাকারী।

কিন্তু সরকারি ভয়ভীতি ও পাকিস্তানবাদীদের বিশেষ প্রচারণায় তেমন কোনো ফল ফলেনি 'ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা প্রদেশে সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-সংগীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং বহুদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়।' (সাঈদ-উর-রহমান ২০০১:৮১)

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন তৎপরতা ও রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কাছে জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম স্থায়ী উপাদানে পরিণত করে।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অন্যতম কর্মী এ অনুষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রধান কারণ ছিল সাংস্কৃতিক এবং একারণে রাজনৈতিক।... পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই সময় আলোচনা হবে, তাঁর মূল্যায়ন হবে, আর ব্যতিক্রম হবে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীর দেশ পাকিস্তানে? পাকিস্তানি শাসক মহল তা-ই চেয়েছিল। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা ও নিষেধের ফলে আমাদের একটি স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা একটি রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। (খান সারওয়ার ২০০১: ১০৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কাছে আরো রাজনৈতিক হয়ে ওঠেন বোধ করি ১৯৬৭ সালের ২১শে জুনের পর থেকে। এদিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের কৃষ্টি ও মূল্যবোধবিরোধী রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করার কথা বলেন। (মোরশেদ ২০১৪: ১৮০) এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র-তরুণ সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার অনেক সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী চেতনার জায়গা থেকে 'ছোট খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে' ছাপেন। খাজা শাহাবুদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদে গণস্বাক্ষরও সংগ্রহ করেন অনেকে। (এবিএম মুসা ২০১৫: ১৮৮) ২৪শে জুন উনিশ জন লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক সরকারি ঐ ঘোষণার বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে দফায় দফায় বিবৃতি দেন। এর বিপরীতে স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিকরাও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রবাদীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

উভয়পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে যে-কাজটি হয়, তা হলো পূর্ব বাংলায় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' (১৯৬৭), 'সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ' (১৯৬৭) গঠিত হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এই ধরনের বক্তব্য বেরিয়ে আসে যে, সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর আক্রমণেরই নামান্তর। পাকিস্তান সরকার ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে এই কাজটিই ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে। পাকিস্তান একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির উপলক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং সাংস্কৃতিক হলেও মর্মার্থ যে রাজনৈতিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত বিতর্কে অবশেষে সরকার নমনীয় হয়। খাজা শাহাবুদ্দীন ১৯৬৭ সালের ৪ঠা জুলাই স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথের সব গান পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি নয়। এছাড়া তিনি দাবি করেন যে, তার বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করা হয়েছে। খাজা শাহাবুদ্দীনের এই ঘোষণায় পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-ভাবমূর্তি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগানোর উপাদান হিসেবে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সরকার-পক্ষ তথা রবীন্দ্রবিরোধী পক্ষের পশ্চাদপসরণ প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারে বিশ্বাসীদের শক্তি অর্জনের ইঙ্গিত দেয়।

তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মাসখানেক পরে রবীন্দ্র-মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কালে। সেবারই প্রথমবারের মতো সাড়ম্বরে কবির মৃত্যুদিবস পালিত হয় এবং অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল অদৃষ্টপূর্ব। (সাঈদ-উর-রহমান ২০০১: ১০৮)

আদতে ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলায় যেন পুনর্জীবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পাঠই ষাটের দশকের পূর্ব

বাংলায় বদলে যায়। ‘ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের গান রাজনৈতিক কারণেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল অবিশ্বাস্য রকমে’ (আসাদ ২০১৫: ২৪৩)– একথা রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় এই ঘটনাটিই ঘটেছে; রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিকভাবে পঠিত ও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া এই কালপর্বে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা রচনার সংখ্যাও অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেড়ে যায়। এই ঘটনাটিও নিছক নিরীহ ব্যাপার নয়, এটিও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণেই ঘটেছে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারীদের নেতিবাচক মনোভাব, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংস্কৃতিকর্মীদের রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণার উৎস মনে করে আঁকড়ে ধরা– এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমকালীন কবিরা প্রেরণা বোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা লেখার। তবে এই রবীন্দ্রনাথ নতুন বিন্যাসে মেরুকরণকৃত; অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক। কবি যখন বলেন, ‘আমার মননে/রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে/এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে/...’ (শামসুর ২০১২ ২৭২/১) তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ কবির চেতনায় ধরা দিয়েছে রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ ‘নতুন বিন্যাসে’। এ কারণে রবীন্দ্রনাথকে অশেষ প্রেরণার উৎস

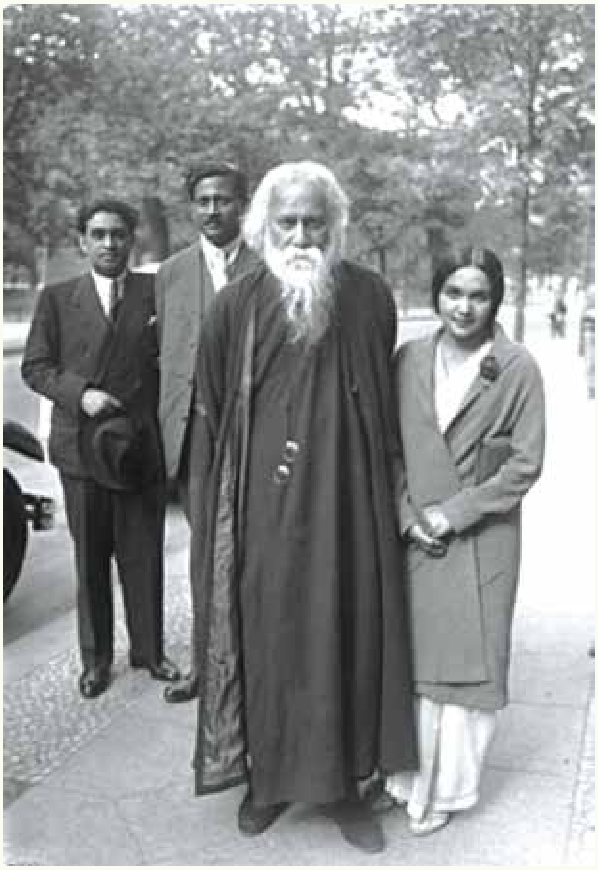

দেখিয়ে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার কবিরা রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। যেমন– ‘আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা/রাত্রিকে রেখেছ ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী/কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন/পেয়েছি তোমার কাছে। ঘৃণার করাতে জর্জরিত/করেছি উন্মত্ত বর্বরের অট্টহাসি কী আশ্বাসে। /প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের/মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।’ (শামসুর ২০১২: ২৫৫-২৫৬/১)

আরো এক ধাপ এগিয়ে কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে আদ্যোপান্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতির মোড়কে মুড়ে দিয়ে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে জুড়ে দিয়েছেন ‘বিপ্লব’ আর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার সঙ্গে। উদাহরণ দেখা যেতে পারে ‘আমরা কতিপয় যুবা/তাই আর সব পরিচয় যখন ভুলে যাই এমনকি ভুলে/যাই নিজেদের নাম, তখনো মনে রাখি/রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবহমান বাংলাদেশ/আমাদের প্রদীপ্ত বিপ্লব/রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি।’ (মহাদেব ২০১১: ৩৯/১)

ষাটের দশকে যত দিন গড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় ও সাহসের উৎস ভেবে লেখা কবিতার সংখ্যা ততই বেড়েছে। শুধু পূর্ণ কবিতা নয়, বিচিত্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ, উপমান বার বার ঘুরেফিরে এসেছে। শামসুর রাহমানের *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যের ‘স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে’ কবিতায় কবি স্বর্গে কী কী দেখেছেন তার একটা তালিকা হাজির করেছেন। সেখানে কবি পিকাসোর ছবি দেখেছেন, দেখেছেন সার্ত, ফকনার বিষয়ক আলোচনা। আরো অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু কবি দেখতে ভোলেননি যে, সেখানে রবি ঠাকুরের গান ভেসে আসছে আর লোকে তাঁর সুরের টানে ছুটে যাচ্ছে। কবির ভাষায়, ‘রবিঠাকুরের গান ভেসে আসে, ছুটে যায় লোক সুরের টানে।/পিকাসোর ছবি ড্রয়িংরুমের/দেয়ালকে দেয় অন্য মানে।’ (শামসুর ২০১২: ১৮৫/১) আবার *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যের ‘কাননবালার জন্যে’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের ছবিকে টাঙিয়ে দিয়েছেন গণ-মানুষের মধ্যে। কবির ভাষায়, ‘বিজয়িনী তুমি, তাই সেলুনে কি পানের দোকানে/রবীন্দ্রনাথের পাশে ঝুলত তোমার ফটোগ্রাফ।’ (শামসুর ২০১২: ২০০/১) সেলুনে-পানের দোকানে রবীন্দ্রনাথের ছবি ষাটের দশকে টানানো থাকত কি না সেটি এখানে অবান্তর। মূল বিষয় হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে কবি গণ-মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করে তাঁকে গণ-ঐতিহ্যে পরিণত করেছেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে সৈয়দ শামসুল হক তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গেরিলাকে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন, ‘যেন তুমি আমাদেরই দ্বিতীয়/শরীর কোনো এক রবীন্দ্রনাথের/গান সমস্ত কিছুর কেন্দ্রেই আছো’। (সৈয়দ শামসুল ২০১২: ১৭২/১) উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক তাৎপর্যের স্বরূপ। বাংলাদেশের আধুনিক চেতনার এমন কোনো কবি ষাটের দশকে পাওয়া দুষ্কর হবে যিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে

কবিতা রচনা করেননি। সিকান্দার আবু জাফর তাঁর *বৈরী বৃষ্টিতে* (১৯৬৫) কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বলেছেন, 'আমাকে বেষ্টন করে আছো/অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো। আমাকে আচ্ছন্ন করে আছো/প্রতি মুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে ধিকৃত/অনিবার্য অভ্যাসের মত।' (সিকান্দার ২০১৭: ১৩৭) শহীদ কাদরীর 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এভাবে– 'জানি চিকিৎসক নও তুমি/কিম্বা ড্রাগস্টোরের কোনো ওষুধ বিক্রেতা/দিনের শুরুতে তুমি,/মিশে আছো অস্ত্রের অম্লরসে,/অনিদ্র রাতের ভোরে যেন টেবিলে সাজানো প্রাতঃরাশ/মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায়, মর্মে/ওঁৎ পেতে/শিকারী বিড়ালের মতো/নিয়ে গেছো আমাদের সবগুলো সোনালি-রূপালি মাছ:...' (শহীদ ২০০০:৭৮) কাদরী রবীন্দ্রনাথকে 'আমাদের চৈতন্যপ্রবাহের ট্রাফিক আইল্যান্ড' এবং 'ডাক্তার' বলতেও কসুর করেননি।

তিনি *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪) কাব্যের 'টাকাগুলো কবে পাবো?' কবিতায় অহম্ নিয়েই স্বীকার করেছেন যে, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নামক বিশাল বাণিজ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর। ষাটের দশকে কাদরীর এই রবীন্দ্রদর্শনের নিশ্চয় একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর *একক সন্ধ্যায় বসন্ত* (১৯৬২) কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথকে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁর প্রেরণার উৎস হিসেবে। শুধু প্রেরণার উৎস নয়; রবীন্দ্রনাথকে তিনি দুইভাবে আবিষ্কার করেছেন কবিতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একাধারে ইতিহাস আর বর্তমান হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন কবির কাছে ইতিহাস একদিন আশ্চর্য উষ্ণতায়/শব্দের ঐশ্বর্য পেয়েছি/অতি পরিচিত শব্দ হঠাৎ সমুদ্র হয়েছে/এবং আমার সমস্ত আগ্রহ/চিলের মতো ডানা মেলেছে/এসব সত্য ইতিমধ্যেই ইতিহাস (সৈয়দ আলী ২০০৯:৬৫)। আবার ষাটের দশকে এসে রবীন্দ্রনাথ যে 'নতুন স্বাদ'– এ হাজির হয়েছেন এ কথাও বলতে কবি কুণ্ঠিত নন–' এখন আবার আমাদের শব্দে/নতুন স্বাদ আসছে/নতুন মৃত্যু, বিচার, পদচারণ এবং বিশ্বাস–/তুমি আমৃত্যুর সাধনায় এ-সব সম্ভাবনাকে প্রদীপ করেছ/তাই তুমি আমার আকাশ/এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর।' (সৈয়দ আলী ২০০৯:৬৫) এভাবে কবিতায় এবং চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ষাটের দশকে এসে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নতুন আবেদন সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের/গানে বাংলার কি হয়, কিভাবে হৃদয়/ভাঙে, নড়ে ওঠে স্বপ্নের বোমারু, জোড়া/লাগে রূপালি দরোজা, অলৌকিক স্পর্শে/নতুন গর্ভের মতো ফুলে ওঠে পেট/এসব সংবাদ কারো অপেক্ষা রাখে না।' (সৈয়দ শামসুল ২০১২: ১৩১/১)

কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেছেন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে জাগানোর এবং খোঁচানোর অঙ্কুশ হিসেবে। যেমন আল মাহমুদ। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন বাঙালির জাগরূক শক্তি হিসেবে। তিনি ভেবে অবাক হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের দেশে কীভাবে মানুষ 'উত্থানরহিত' থাকে। এ কারণে তীর্যক ভঙ্গিতে কবি বলেছেন- বুঝি না, রবীন্দ্রনাথ কী ভেবে যে বাংলাদেশে ফের/বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।/গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে/পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই। (আল মাহমুদ ২০০০:৭৯) এর মধ্য দিয়ে আল মাহমুদ ষাটের দশকের অবরুদ্ধ বাস্তবতাকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পুনর্জাগরণ ঘটানোর, উত্থান ঘটানোর গোপন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েছেন পূর্ব বাংলা তথা 'বঙ্গদেশ'– এর 'উত্থান'-এর দ্বিজমন্ত্র হিসেবে। এ কারণে তিনি বলেছেন, 'এ কেমন অন্ধকার উত্থান রহিত/নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।' কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরলেই যেন নৈঃশব্দ্য আর নিষ্ফলতা কেটে যাবে। যেমন, শামসুর রাহমানের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত হয়েছেন বাঙালির সত্তা হিসেবে–

'যেমন রৌদ্রের তাপ জ্যোৎস্নার মদির মায়ালোকে/হাওয়ার নির্ঝরে/অথবা শ্রাবণে/অক্লান্ত বর্ষণে বেঁচে থাকি মাঝে-মাঝে/নিজেরই অজ্ঞাতে,/তেমনি তোমার/কবিতায়, গানে প্রতিধ্বনিত হয়ে জাগে/আমাদের সত্তার আকাশ।' (শামসুর ২০১২: ২৩১/১) শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সংকটে এক বিরাট আশ্রয় হিসেবে কবির কাছে কীর্তিত হয়েছেন জীবন যখন ক্রমে কেবলি শুকিয়ে যায়, ডোবে/পাঁকের আবর্তে আর বর্বরের বাচাল আক্রোশে/অবলুপ্ত জ্ঞানীর সুভাষ, জেনেছি তখন/অলৌকিক পদ্মের মতন/তোমার স্মরণ/উন্মোচিত হয়,/হয় উদ্ভাসিত/অসংখ্য প্রাণের তীর্থে এবং তোমার/গানে গানে মৃত্যুর তুহিন শীতে ফোটে/ফোটে অবিরত/জীবনের পরাক্রান্ত ফুল।' (শামসুর ২০১২: ২৩১-২৩২/১)

ষাটের দশকে কবিরা যখনই অবরুদ্ধ বোধ করেছেন, তখনই অনেকে নিজের আশ্রয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছে তাদের বদ্ধ ঘরের একটি মুক্ত জানালা; মুক্তির এক টুকরো আকাশ। অনেকে বোধ করেছেন চারদিকে সবকিছু যখন বন্ধ, তাদের কাছে যখন কেউ আসে না বা আসতে দেওয়া হয় না, তখনও রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন তাদের চৈতন্যের গভীরে নিষ্প্রদীপ ঘরে থাকি রাত্রিদিন। দরজা-জানালা/বন্ধ সবি। বড় শ্বাসকষ্ট হয়; হঠাৎ কখনো/ইচ্ছে করে 'অ্যাম্বুলেন্স চাই' বলে তারস্বরে দূর/আকাশ ফাটাই। কখনো-বা মাছ শিকারির মতো/ব'সে থাকি, নিবিড় অপেক্ষমাণ। এ বন্ধ ঘরেও/ভিড়ছে সোনার তরী, আপনারা স্বচক্ষে দেখুন।' (শামসুর ২০১২: ৩১০/১) এই যে রবীন্দ্রনাথের পাঠ, এই পাঠ কোনো নিরীহ সাধারণ পাঠ নয়। এই পাঠ রাজনৈতিক। এই পাঠের সঙ্গে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। একারণেই বোধ করি কবি বলেছেন, 'তুমি নও সীমিত শুধুই কোনো পঁচিশে বৈশাখে/তোমার নামের ঢেউ একটি

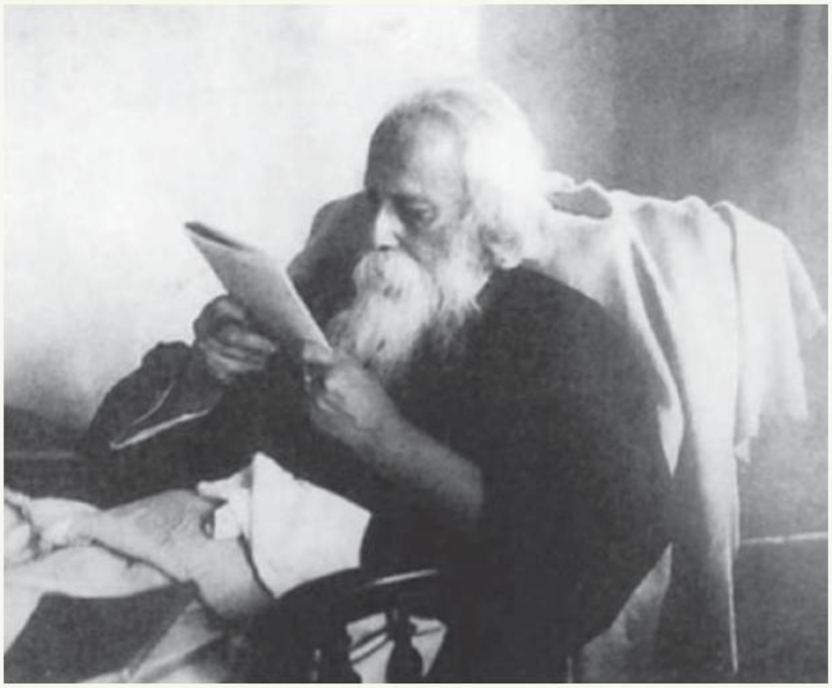

রয়েছে। আসলে ঐ সময় রবীন্দ্রনাথকে তারা নিয়েছিলেন তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে। আবার এই রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাঙালির সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পরেও রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার বাঙালির চেতনায় একই তাৎপর্যে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। ষাটের দশকে, মুক্তিযুদ্ধে, বর্তমানে– সব সময়ই রবীন্দ্রনাথ আসলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষের রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদাভাবেই পঠিত ও গৃহীত হন।

একারণেই বোধ করি কবি বলেছেন, 'তুমি নও সীমিত শুধুই কোনো পঁচিশে বৈশাখে/তোমার নামের ঢেউ একটি দিনের/সংকীর্ণ পরিধি ছিঁড়ে পড়েছে ছড়িয়ে/রূপনারানের কূলে, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে/অনন্তের শুভ্রতায়/তুমি নও সীমিত শুধুই/ পঁচিশে বৈশাখে।' (শামসুর ২০১২: ২৩১/১) আর কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন প্রতিরোধের হাতিয়ার আর পরিণতি হিসেবে, কাঠের লাঙল যারা চেপে রাখতো মাটির ঔরসে,/সেইসব শিল্পী, সেইসব শ্রমিক, যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে, যারা স্বপ্ন দেখতো রাতে। ধলেশ্বরী নদী-তীরে/পিসীদের গ্রাম থেকে ওরা এখন শহরে আসছে।/কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে,/কপালে বেঁধেছে লালসালুর আকাশ/শহর জয়ের উল্লাসে ওরা রবীন্দ্রনাথকে বলছে/স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের গানকে বলছে স্টেনগান'। (নির্মলেন্দু ২০১১: ৫৬/১)

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতা এবং বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ তোলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার এই ধরনের প্রকাশ ষাটের দশকের সমগ্র সময়জুড়ে অর্থাৎ ষাটের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ উভয় সময়েই লক্ষ করা গিয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ষাটের দশকে যেসব কবি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কবিতা লিখছেন, তারা কাব্যতত্ত্বের দিক থেকে, কাব্যরুচির দিক থেকে রবীন্দ্রাথকে গ্রহণ করার কথা নয়। তারা রবীন্দ্রবিরোধী ত্রিশের কবিদেরও উত্তর-যুগের কবি। ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা আর জীবনদৃষ্টি থেকে তাদের দূরত্ব যোজন যোজন। তবে রবীন্দ্রনাথ এইসব কবির শরণস্থল হয়ে উঠেছে কোন দিক থেকে? এই প্রশ্নের মধ্যেই ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিদের রবীন্দ্রানুগত্য ও রবীন্দ্রমুগ্ধতার প্রাণভোমরা নিহিত

তথ্যসূত্র

- আল মাহমুদ (২০০০), *কবিতাসমগ্র*, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।
- আসাদ চৌধুরী (২০১৫), 'সংস্কৃতির বিকাশধারা', *রক্তাক্ত বাংলা* (সংকলিত), ষাট প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।
- এবিএম মুসা (২০১৫), *আমার বেলা যে যায়*, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
- খান সারওয়ার মুরশিদ (২০০১), *কালের কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- নির্মলেন্দু গুণ (২০১১), *কাব্যসমগ্র-১*, চতুর্থ সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।
- মহাদেব সাহা (২০১১), কাব্যসমগ্র-১, চতুর্থ প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।
- মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪), *স্বাধীনতার পটভূমি*। ১৯৬০ দশক, ২য় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
- সাঈদ-উর রহমান (২০০১), *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।
- রনেশ দাশগুপ্ত (২০১৪), রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র (সম্পা. সৌমিত্র শেখর), দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- শহীদ কাদরী (২০০০), *শহীদ কাদরীর কবিতা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
- শামসুর রাহমান (২০১২), *কবিতাসমগ্র-১*, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।
- সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭), *কবিতাসমগ্র*, বিভাস, ঢাকা।
- সৈয়দ আলী আহসান (২০০৯), *কবিতাসমগ্র*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
- সৈয়দ শামসুল হক (২০১২), *কবিতাসমগ্র ১*, প্রথম মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।

ড. কুদরত-ই-হুদা: গবেষক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগঃ সময় এখনই

অদিতি রিতু

ছোটোবেলা থেকেই ফারাবির পৃথিবীটা ছিল একটু রঙিন। অন্যরা যখন অবসরে মোবাইলে গেম খেলত বা টিভি দেখত, তখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আঁকাআঁকি করত। কখনো ফুল, কখনো কার্টুন চরিত্র, কখনো আবার নিজের কল্পনার মানুষ– তার খাতার পাতাগুলো যেন ছোট্ট একটি পৃথিবী ছিল। শুধু আঁকাই নয়, রঙিন সুতা দিয়ে ছোটো ছোটো ক্রোশেট জিনিস বানাতেও সে খুব ভালোবাসত। ইউটিউব দেখে দেখে সে নিজের হাতেই শিখে নিয়েছিল ব্যাগ, ফুল, কি-রিং আর ছোট্ট প্লাশির মতো জিনিস বানানো।

প্রথমদিকে সবাই এটাকে শুধু শখ হিসেবেই দেখত।

–কেউ বলত, 'এসব বানিয়ে কী হবে?'

–আবার কেউ বলত, 'পড়াশোনায় মন দাও, এসব সময় নষ্ট।'

কথাগুলো শুনে মাঝে মাঝে ফারাবির মন খারাপ হতো। কিন্তু যখনই সে রংতুলি হাতে নিত বা উলের সুতা আঙুলে জড়িয়ে নতুন কিছু তৈরি করত, তখন তার মনে হতো–এটাই তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।

একদিন স্কুলে তার বানানো একটি ক্রোশেট ফুল দেখে তার এক বন্ধু খুব অবাক হয়ে বলল, 'এটা তুমি বানিয়েছ? আমি একটা কিনতে চাই!'

সেদিনই প্রথম ফারাবির মাথায় নতুন চিন্তা এলো। 'আমি কি আমার শখ দিয়েই কিছু করতে পারি না?'

ছোট্ট সেই চিন্তা থেকেই শুরু হলো তার উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প।

নিজের জমানো অল্প কিছু টাকা দিয়ে সে কিছু রঙিন সুতা, হুক আর আঁকার সরঞ্জাম কিনল। তারপর একটি ছোটো অনলাইন পেইজ খুলল। সেখানে নিজের আঁকা ছবি, বুকমার্ক, কাস্টম পোর্ট্রেট আর ক্রোশেট পণ্যের ছবি পোস্ট করতে শুরু করল।

শুরুটা অবশ্য খুব সহজ ছিল না। প্রথম কয়েকদিন কোনো অর্ডারই এলো না। পোস্টে খুব কম মানুষ রিয়্যাক্ট করত। মাঝে মাঝে সে হতাশ হয়ে যেত। মনে হতো, হয়ত মানুষ তার কাজ পছন্দ করছে না। তবুও সে থামেনি। বরং আরও নতুন ডিজাইন শিখতে লাগল। রাতে বসে বসে নতুন স্টিচ প্র্যাকটিস করত, ভিডিও দেখে বানানো শিখত, আবার নিজের আঁকার স্টাইলও উন্নত করার চেষ্টা করত।

একদিন হঠাৎ তার বানানো একটি ছোট্ট ক্রোশেট কমলা শিয়ালের ছবি অনেক মানুষের নজরে পড়ে গেল। কয়েকজন একসাথে অর্ডার করল। সেই প্রথম ফারাবি বুঝতে পারল মানুষ সত্যিই তার কাজ পছন্দ করছে।

প্রথম আয় হাতে পাওয়ার দিনটি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলোর একটি ছিল। টাকার পরিমাণ খুব বেশি ছিল না, কিন্তু সেটি ছিল তার নিজের প্রতিভা আর পরিশ্রমের ফল। সে সেই টাকা দিয়ে আবার নতুন সুতা কিনল, নতুন স্কেচবুক কিনল এবং আরও ভালোভাবে কাজ শুরু করল।

ধীরে ধীরে তার ছোট্ট ব্যবসাটি বড়ো হতে লাগল। এখন সে শুধু ক্রোশেট ফুল নয়, ব্যাগ, পাউচ, কি-রিং, টেডি এমনকি কাস্টম চরিত্রও বানাতে শুরু করল। পাশাপাশি তার আঁকা কাস্টম পোর্ট্রেট এবং বুকমার্কও অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

তবে এই পথেও অনেক বাধা ছিল। কখনো রাত জেগে অর্ডার শেষ করতে হয়েছে, কখনো হাত ব্যথা হয়ে গেছে। কখনো আবার কোনো বানানো পণ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে যে অনেক কষ্ট করে বানানো জিনিস কেউ শেষ মুহূর্তে নেয়নি। তখন খুব কষ্ট লাগত। কিন্তু ফারাবি জানত, ব্যর্থতা ছাড়া সফলতা আসে না।

সে ধীরে ধীরে শিখে গেল কীভাবে নিজের কাজের মূল্য দিতে হয়, কীভাবে গ্রাহকদের সাথে কথা বলতে হয়, আর কীভাবে ছোটো একটি উদ্যোগকে বড়ো করে তুলতে হয়।

আজ ফারাবির ছোট্ট পেইজটি অনেক মানুষের পরিচিত। তার বানানো ক্রোশেট পণ্য মানুষ উপহার দেয়, ঘর সাজায় আবার তার আঁকা ছবিও অনেকেই সংগ্রহ করে। যে মানুষগুলো একসময় বলেছিল 'এসব করে কিছু হবে না', তারাই এখন তার কাজের প্রশংসা করে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, ফারাবি এখন নিজের স্বপ্নের কাজ করছে। সে বুঝেছে, উদ্যোক্তা হওয়া মানে শুধু টাকা আয় করা নয়; বরং নিজের ভালোবাসার কাজকে সম্মান দেওয়া এবং সেটিকে নিজের পরিচয় বানানো।

তার গল্প আমাদের শেখায় যদি মানুষ নিজের প্রতিভার ওপর বিশ্বাস রাখে এবং ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে, তাহলে ছোট্ট একটি শখও একদিন বড়ো স্বপ্নে পরিণত হতে পারে।

রংতুলি আর রঙিন সুতার ছোট্ট পৃথিবী থেকেই ফারাবির উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আর সেই যাত্রাই একদিন তাকে আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী এবং সফল একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

ফারাবির এই গল্প বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তার জন্য অনুপ্রেরণা আর কাজের প্রতি অদম্য ভালোবাসার উৎস। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও আজ দেশে অনেক নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা বিভিন্ন রকমের ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। এ সকল ব্যবসা ঘিরে গড়ে উঠেছে অর্থনীতির নানাবিধ ক্ষেত্র। মানুষ আজ চাকরি না খুঁজে নিজেই ব্যবসা করার চিন্তা করতে পারছে, অন্যকে চাকরি দিচ্ছে।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সাথে বিভিন্ন বয়সের মানুষ তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ব্যবসা চালু করছে। অনলাইনে হরেক রকমের পণ্য যেমন রান্না করা খাবার, জামাকাপড়, ইলেকট্রনিকস, কসমেটিকস ইত্যাদির অর্ডার গ্রহণ করে সময়মতো পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতার দুয়ারে। ফলে ক্রেতা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন পছন্দের জিনিস। এভাবে ক্রেতার সময় ও শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে অর্থাৎ মানুষের জীবন হচ্ছে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

তবে ফারাবিসহ দেশের উদ্যোক্তাগণ প্রায়শই নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার সম্মুখীন হন যেমন;

১. পুঁজির স্বল্পতা।
২. সঠিক সময়ে চাহিদামতো ঋণ না পাওয়া।
৩. সুদের উচ্চ হার।
৪. আর্থিক সহযোগিতা ও প্রণোদনার অভাব।
৫. প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের স্বল্পতা।
৬. সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব।
৭. আন্তর্জাতিক বাজার ও ক্রেতার সাথে যোগাযোগের সুযোগ না পাওয়া।
৮. পণ্যের প্রচার-প্রচারণার অপ্রতুলতা।
৯. বড়ো কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা।
১০. ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স, অনলাইন পেমেন্ট বা আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে পড়া।
১১. প্রশিক্ষিত কর্মী ও ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতার ঘাটতি ফলে কম উৎপাদনশীলতা।

১২. বিদ্যুৎ সমস্যা, পরিবহণ ব্যয়, ইন্টারনেটের সীমাবদ্ধতা ও কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি।

১৩. লাইসেন্স, ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্রেড লাইসেন্স নবায়নসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা।

দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার সুফল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেসকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করলে উদ্যোক্তাগণ লাভবান হবেন:

১. সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে।

২. আর্থিক প্রণোদনাসহ নানারকম লজিস্টিক্যাল সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। জামানতবিহীন বা স্বল্প সুদে SME ঋণ প্রদান করতে হবে।

৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার থেকে সার্বিক দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৪. ব্যবসা পরিকল্পনা, হিসাবরক্ষণ, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে SME Foundation এবং Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. ফেসবুক পেইজ, অনলাইন শপ, মোবাইল ব্যাংকিং ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ব্যবসা বিকাশে সহায়তা করা।

৬. কর ছাড়, কর অবকাশ, বা কর মওকুফ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দেশীয় বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করা।

৭. বিদেশি ও বড়ো বড়ো কোম্পানির সাথে অসম প্রতিযোগিতা থেকে উদ্যোক্তাদের রক্ষা করা।

৮. দেশীয় পণ্যের মান উন্নয়ন ও ব্র্যান্ডিং করে দেশি-বিদেশি বাজারে সক্ষমতা বাড়াতে ও প্রতিযোগিতা করতে সহায়তা করা।

৯. সহজ নিবন্ধন ব্যবস্থা, শিল্পাঞ্চল সুবিধা ও রপ্তানি সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নেওয়া।

১০. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, নিরাপদ ব্যবসা পরিবেশ ও সহজ অর্থায়ন নিশ্চিত করা।

১১. সর্বোপরি সঠিক নীতি সহায়তা, প্রযুক্তির ব্যবহার, সহজ অর্থায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এই খাতকে এগিয়ে নেওয়া।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তরুণ উদ্যোক্তাদের খুদে উদ্যোগ এবং startup ব্যবসাকে বিকশিত করতে পারলে তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ বাড়বে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী ও গতিশীল হবে। আর তাহলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফারাবিদের মতো উদ্যোক্তাদের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটবে। এখনই সঠিক সময় – আসুন সকলে মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করি, উদ্যোক্তা তৈরি করি ও তাদের বিকাশে সাধ্যমতো চেষ্টা করি।

অদিতি রিতু: প্রাবন্ধিক এবং উদ্যোক্তা

তামাকের করালগ্রাসে জনস্বাস্থ্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

খোন্দকার মাহ্ফুজুল হক

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তামাক আজও একটি গভীর জনস্বাস্থ্য সংকটের নাম। ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই নীরব ঘাতক প্রতিনিয়ত কেড়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ, ক্ষতিগ্রস্ত করছে অর্থনীতি এবং দুর্বল করে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে তামাকের ব্যবহার একটি দীর্ঘ ও জটিল অধ্যায়। ধারণা করা হয়, প্রায় ৫,০০০ বছর পূর্বে আমেরিকার আদিবাসীরা প্রথম তামাক ব্যবহার শুরু করে। তারা ধর্মীয় আচার, চিকিৎসা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তামাককে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করত। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপীয়দের মাধ্যমে তামাক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ।

ইউরোপে তামাক দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ১৬শ ও ১৭শ শতকে এবং পরবর্তীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে তামাক প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অংশে পরিণত হয় । প্রথমদিকে তামাককে ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও পরবর্তীতে এর ক্ষতিকর প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

শিল্পবিপ্লবের সময় সিগারেট উৎপাদনে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তামাকের ব্যাপক বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। এতে করে তামাক সহজলভ্য হয়ে ওঠে এবং ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ২০ বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে তামাক ক্যানসার, হৃদরোগ ও শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক রোগের প্রধান কারণ।

বর্তমানে তামাক একটি বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, একসময় ধর্মীয় ও সামাজিক আচার হিসেবে ব্যবহৃত তামাক আজ মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড়ো হুমকিতে পরিণত হয়েছে। ফলে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তামাককে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'সবচেয়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর কারণ' হিসেবে চিহ্নিত করলেও বাংলাদেশে এর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশে প্রায় ৩৫.৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কোনো না কোনোভাবে তামাক ব্যবহার করে। এছাড়া দেশে প্রায় ৩৭.৮ মিলিয়ন মানুষ তামাক ব্যবহারকারী, যা জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ। তামাকের ব্যবহার শুধু ধূমপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; জর্দা, গুল, খৈনি ইত্যাদি ধোঁয়াবিহীন তামাকও সমানভাবে ক্ষতিকর। বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হারও উদ্বেগজনকভাবে বেশি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা- এর তথ্য অনুযায়ী, তামাকের কারণে প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৮ মিলিয়নের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত কারণে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১,৩০,০০০ মানুষ তামাকের কারণে মারা গেছে, যা মোট মৃত্যুর প্রায় ২১.৯ শতাংশ। অন্য একটি তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতিবছর প্রায় ১,৯৯,০০০ মানুষের মৃত্যু তামাকের কারণে ঘটে। এই মৃত্যুর বড়ো একটি অংশ ঘটে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং শ্বাসতন্ত্রের রোগের মাধ্যমে। গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান পুরুষদের মধ্যে মৃত্যুর প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত দায়ী। এছাড়া– পরোক্ষ ধূমপান বা 'সেকেন্ডহ্যান্ড স্মোক' ও সমানভাবে মারাত্মক। তামাক ব্যবহার না করেও বহু মানুষ এই বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে।

তামাকের ধোঁয়ায় থাকা হাজারো রাসায়নিক পদার্থ মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং এর মধ্যে বহু উপাদান ক্যানসার সৃষ্টিকারী। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে তামাক ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। নিয়মিত ধূমপান ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে । এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকও মুখগহ্বরের ক্যানসার, দাঁতের ক্ষয় এবং বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ থেকে তামাক একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে

অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি পরোক্ষ ধূমপান শিশু ও নারীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর, যা একটি নিরাপদ পরিবেশের অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে। বলা যায়, তামাক শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, বরং পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

মানুষের শরীরেই শুধু নয়, তামাক পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। তামাক চাষের জন্য বন উজাড় হয়, মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় এবং সিগারেটের বাট পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। এছাড়া, তামাক উৎপাদন ও ব্যবহারের পুরো প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

তামাক শুধু স্বাস্থ্য নয়, অর্থনীতির ওপরও বড়ো ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে বছরে প্রায় ৩০৫.৬ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হয়। আরেকটি হিসাব অনুযায়ী, এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৯১ বিলিয়ন টাকারও বেশি। এতে করে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেমন চাপে পড়ছে, তেমনি দরিদ্র পরিবারগুলো আরও দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবারে একজন ব্যক্তি তামাকাসক্ত হওয়ার কারণে চিকিৎসা খরচ বাড়ে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ব্যাহত হয়।

তামাকের ব্যবহার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি নারী ও শিশুদের জন্য একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য হুমকি রূপে চিহ্নিত। বিশ্বব্যাপী তামাকের ধোঁয়া ও ধোঁয়াবিহীন পণ্য নারীদের শারীরিক, মানসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে তামাক ব্যবহার গর্ভপাত, অকাল প্রসব এবং কম ওজনের শিশুর জন্মের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে নারীরা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে তামাকের শিকার হচ্ছেন। অনেক নারী ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন গুল বা জর্দা ব্যবহার করেন, যা মুখগহ্বরের ক্যানসার এবং অন্যান্য জটিল রোগের কারণ হতে পারে। একইভাবে শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, কারণ তাদের শ্বাসতন্ত্র ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সেকেন্ডহ্যান্ড স্মোক শিশুদের হাঁপানি, নিউমোনিয়া এবং কানের সংক্রমণের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

পরিবারের মধ্যে যদি কেউ ধূমপান করে, তবে শিশুরা নিয়মিত বিষাক্ত ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসে, যা তাদের মানসিক বিকাশেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়া সামাজিক পরিবেশে তামাকের সহজলভ্যতা শিশুদের মধ্যে ভবিষ্যতে আসক্তির ঝুঁকি তৈরি করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং কঠোর আইন প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়। তাই পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র– সব পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ না করলে নারী ও শিশুদের এই নীরব বিপদ থেকে রক্ষা করা কঠিন হবে।

বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা উদ্বেগজনক। দেখা গেছে, ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে প্রায় ৬.৯ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে। এটি একটি ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ। শহর ও গ্রাম উভয় এলাকাতেই কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ধূমপান, জর্দা, গুল ও খৈনির মতো তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে, যা ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করছে। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি বড়ো হুমকি। কারণ, অল্প বয়সে তামাকের সাথে পরিচিত হলে পরবর্তীতে তা ছাড়ার সম্ভাবনা কমে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে ই-সিগারেট বা ভেপিংয়ের মতো নতুন প্রবণতাও তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

তরুণদের তামাক আসক্তি ও ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো কৌতূহল, বন্ধুবান্ধবের প্রভাব, মানসিক চাপ এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ভুল ধারণা। অনেক সময় মিডিয়া ও সিনেমায় ধূমপানকে 'স্টাইলিশ' হিসেবে উপস্থাপন করাও তরুণদের আকৃষ্ট করে। পরিবারে কেউ ধূমপান করলে সেটিও একটি বড়ো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

তরুণদের মধ্যে মূলত দুই ধরনের আসক্তি দেখা যায় । ধূমপান (সিগারেট ও বিড়ি) এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা, গুল, খৈনি)। সাম্প্রতিক সময়ে ই-সিগারেট বা ভেপিংও শহুরে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যা অনেকে নিরাপদ মনে করলেও বাস্তবে এটি নিকোটিন আসক্তি বাড়ায়।

তরুণদের ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র তামাক ব্যবহারে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পাশাপাশি মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়ে মনোযোগ কমে যায় এবং পড়াশোনায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

দীর্ঘমেয়াদে তামাক আসক্তি জীবনের গুণগত মান কমিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে গুরুতর রোগের ঝুঁকি তৈরি করে। এটি অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কেও বিরূপ প্রভাব ফেলে, যা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে গত দুই দশকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। ২০০৫ সালে প্রণীত Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণের মূল আইন হিসেবে কাজ করছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে এই আইনের সংশোধনের মাধ্যমে ধোঁয়াবিহীন তামাককেও আইনের আওতায় আনা হয় এবং তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সরকার জনসমাগমস্থল, কর্মক্ষেত্র ও গণপরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি তামাকজাত পণ্যের প্যাকেটে বাধ্যতামূলক

গ্রাফিক স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্রদর্শন করা হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ২০২৫ সালের সংশোধিত আইনের মাধ্যমে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে– যার মধ্যে রয়েছে তামাক বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ, ই-সিগারেটসহ নতুন তামাকজাত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের আশপাশে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করা ।

এছাড়া সরকার তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি, জনসচেতনতা কার্যক্রম এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ (২০৪০) গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। তবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক প্রমাণ তৈরি করে নীতিনির্ধারণে সহায়তা করছে। এই নেটওয়ার্ক গবেষক, শিক্ষাবিদ ও উন্নয়নকর্মীদের একত্রিত করে তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী জ্ঞানভিত্তি তৈরি করেছে। অন্যদিকে PROGGA (Knowledge for Progress) জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি-অভিযান ও গবেষণার মাধ্যমে তামাকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংস্থাটি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন, পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ, তামাকজাত পণ্যের প্যাকেটে সতর্কবার্তা, তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি প্রভৃতি। সম্প্রতি সরকারের Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Ordinance ২০২৫ প্রণয়নের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অনেক স্থানে আইন থাকলেও তার কার্যকর প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিকভাবে তামাক অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যবহার বেশি। এছাড়া অনেকেই তামাককে 'স্ট্রেস কমানোর উপায়' হিসেবে দেখে, যা একটি ভ্রান্ত ধারণা। বাস্তবে তামাক মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই ক্ষতিকর। নারীদের মধ্যে ধূমপানের হার তুলনামূলক কম হলেও ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার বেশি, যা একটি উপেক্ষিত সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

তামাকের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইয়ের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে যার মাধ্যমে তামাকমুক্ত ভবিষ্যতের পথরেখা এগিয়ে নেওয়া সহজতর হবে। কঠোর আইন প্রয়োগ করা এর মধ্যে অন্যতম। আইন থাকলেই হবে না, তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধি করা। তামাকজাত পণ্যের ওপর উচ্চ কর আরোপ করলে ব্যবহার কমে যায় এটি প্রায় প্রমাণিত। সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্কুল, কলেজ, ধর্মীয়স্থান ও গণমাধ্যমে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে তামাকবিরোধী প্রচারণা জোরদার করতে হবে। বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা। তামাক চাষি, তামাকশিল্প কর্মী, বিপণন ও বাজারজাতকারীদের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। জীবিকার বিকল্প উৎস পেলে অনেকেই এ ক্ষেত্রগুলো থেকে সরে আসবে, যা তামাকমুক্ত ভবিষ্যতের পথচলাকে সহজতর করবে। চিকিৎসা ও সহায়তা নিয়ে তামাকাসক্তদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তামাকাসক্তদের জন্য কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা সেবা বাড়ানোর পাশাপাশি আসক্তি পরিহারে বিকল্প পথ দেখাতে হবে ।

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং সামাজিক সহায়তা– দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তামাক ত্যাগের প্রথম ধাপ হলো দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নির্দিষ্ট 'কুইট ডেট' নির্ধারণ করা। ধূমপানের ট্রিগার যেমন মানসিক চাপ, সামাজিক পরিবেশ বা অভ্যাসগত সময়গুলো চিহ্নিত করে তা এড়িয়ে চলা কার্যকর হতে পারে। পাশাপাশি নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (যেমন গাম বা প্যাচ) এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ তামাক ত্যাগে সহায়ক।

সামাজিক পর্যায়ে পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যদের উৎসাহ, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং ইতিবাচক মনোভাব একজন ব্যক্তিকে তামাক থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে তামাকবিরোধী প্রচারণা এবং কাউন্সেলিং সেবা চালু করাও কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে। এছাড়া গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকবিরোধী বার্তা প্রচার সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর মতে, সমন্বিত উদ্যোগ, যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সরকার একসাথে কাজ করে– এটি তামাক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। তাই তামাকমুক্ত জীবন গড়তে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির পাশাপাশি সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশসহ বৈশ্বিক ধর্মপ্রাণ সমাজে তামাক প্রতিরোধে ধর্মীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবনকে সুরক্ষিত রাখা একটি মৌলিক কর্তব্য। ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নিজের ক্ষতি করা এবং অন্যের ক্ষতি করা উভয়ই নিষিদ্ধ। তামাক ব্যবহার সরাসরি শরীরের ক্ষতি করে। ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্কসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে ধ্বংস করে। অনেক ইসলামি পণ্ডিত তামাককে 'মাকরূহ' বা 'হারাম'-এর কাছাকাছি বলে বিবেচনা করেছেন, কারণ এটি ধীরে ধীরে মৃত্যু ডেকে আনে। একইভাবে অন্যান্য ধর্মেও শরীরকে পবিত্র আমানত হিসেবে দেখা হয়, যা নষ্ট করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও তামাক ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ। একজন ধূমপায়ী শুধু নিজের ক্ষতি করেন না, বরং আশপাশের মানুষদেরও ঝুঁকিতে ফেলেন। 'সেকেন্ডহ্যান্ড স্মোক' বা পরোক্ষ ধূমপান শিশু, নারী এবং বৃদ্ধদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ফলে তামাক ব্যবহার একটি সামাজিক অন্যায়ে পরিণত হয়। নৈতিকভাবে একজন সচেতন নাগরিকের উচিত অন্যের ক্ষতি না করা এবং একটি সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা।

তামাক প্রতিরোধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির বা গির্জায় খুতবা, ধর্মীয় আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে তামাকের ক্ষতি তুলে ধরা যেতে পারে। ইমাম, পুরোহিত বা ধর্মীয় নেতারা যদি তামাকবিরোধী বার্তা দেন, তাহলে তা সাধারণ মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে জুমার খুতবায় বা ধর্মীয় সমাবেশে তামাকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে।

পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নৈতিক শিক্ষা পরিবারের মধ্য থেকেই শুরু হয়। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের সামনে ধূমপান না করা এবং ছোটোবেলা থেকেই তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে যুক্ত করে এই শিক্ষা দিলে তা আরও কার্যকর হয়।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও ধর্মীয় নেতাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তামাকবিরোধী প্রচারণা চালানো যেতে পারে। এতে করে মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা তৈরি হবে, যা আইন প্রয়োগের চেয়েও বেশি কার্যকর হতে পারে।

তামাক আজ বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। প্রতিবছর ৩১শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তামাক শুধু একটি ব্যক্তিগত অভ্যাস নয়, এটি সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংকটও বটে। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান।

নিদারুণ এক বাস্তবতা হলো তামাক আজ বাংলাদেশের জন্য একটি বড়ো জনস্বাস্থ্য সংকট। এটি শুধু ব্যক্তির জীবন নয়, পুরো সমাজ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই এখনই সময় সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার। সরকার, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং প্রতিটি সচেতন নাগরিককে একসাথে কাজ করতে হবে। একটি তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা শুধু একটি স্বপ্ন নয় বরং এটি একটি জরুরি প্রয়োজন। কারণ, প্রতিটি সুস্থ নিশ্বাসই একটি সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতীক। সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সামাজিক আন্দোলনই তরুণ প্রজন্মকে তামাকের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, তামাক প্রতিরোধ শুধু আইন বা চিকিৎসার বিষয় নয়; এটি একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনও। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে যদি সমাজে সচেতনতা গড়ে তোলা যায়, তাহলে একটি সুস্থ, তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব।

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক: লেখক, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও গবেষক

সিলেটের বাসিয়া নদীর খাল পুনঃখনন উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজে কোদাল হাতে নিয়ে মাটি কেটে সিলেটের বাসিয়া নদীর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। ২রা মে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজে কোদাল হাতে নিয়ে মাটি কেটে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। সিলেট শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে কাশিপুর ইউনিয়নের এই বাসিয়া নদী সুরমা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। পুনঃখনন কাজের উদ্বোধনে উপস্থিত এলাকাবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, এই যে বাসিয়ায় যে নদীটা আছে, এখানে যে খালটা, এটা সেই ১৯৭৭ সালে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান খনন করেছিলেন। তারপরে আবার এই খাল চলতে চলতে এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এই খালটা আমরা আবারো কাটতে চাই।

বাসিয়া নদীর এই খাল আবারো কাটার কারণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই খাল যদি আমরা কাটি, প্রায় ৮০ হাজার কৃষক প্রথমত সরাসরি উপকার পাবে। এর বাইরে দেড় লাখ কৃষক পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। যাদের জমি-জমা আছে এই খালের দুই পাশে, ফসল যে উৎপাদন হয়, প্রায় ৭ হাজার মেট্রিক টন ফসল বেশি উৎপাদন হবে। তিনি আরো বলেন, শুধু এই খাল না, সারা বাংলাদেশে এরকম অনেক বাসিয়া খাল আমরা খনন করব। কারণ, আমরা যদি খালগুলো খনন করতে পারি, কৃষক ভাইদের জন্য সুবিধা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, এই এলাকায় আমরা এই বাসিয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খাল খননের কাজ শুরু করলাম। এর মধ্যে দেশের অনেকগুলো জায়গায় প্রায় ৬০-টার মতো জেলায় এরই মধ্যে খাল খনন শুরু হয়ে গেছে। এই খাল খনন এবারই শেষ হবে না। এটা প্রায় ৪০ কিলোমিটার। তার মধ্যে ২৩ কিলোমিটার খাল আমরা পুনঃখনন করব।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন ৮ই মে ২০২৬ রাজধানীর মালিবাগে থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন হাসপাতালে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

থ্যালাসেমিয়া

ডা. দীপান্বিতা মণ্ডল

বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে একটি হলো থ্যালাসেমিয়া। এটি একটি বংশগত রোগ অর্থাৎ পিতামাতার কাছ থেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে চলে আসে। রোগটি ছোঁয়াচে নয়, বরং এটি জিনের মাধ্যমে পরিবার থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে হলে এর প্রকোপ বেশি দেখা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এ রোগ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। থ্যালাসেমিয়ায় রক্তের হিমোগ্লোবিনের গঠনগত ত্রুটির কারণে পরিণত লোহিত রক্তকণিকা পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হওয়ার আগেই ভেঙে যায় এবং রক্ত সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০-৮০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

থ্যালাসেমিয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এক ধরনের বংশগত haemolytic anemia বলা হয়, অর্থাৎ যে রোগে লোহিত রক্তকণিকা পরিণত হওয়ার আগেই ধ্বংস হয়ে যায়। থ্যালাসেমিয়াতে জেনেটিক মিউটেশনের কারণে লোহিত রক্তকণিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিমোগ্লোবিন তৈরি ব্যাহত হয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, হিমোগ্লোবিনের দুটি অংশ– একটি 'হিম' নামক লৌহবিশিষ্ট রঞ্জক (যার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়) এবং 'গ্লোবিন' নামক প্রোটিন। থ্যালাসেমিয়া মূলত এই গ্লোবিন উৎপাদনের ত্রুটির কারণে হয়।

গ্লোবিন তৈরি হয় α (আলফা) এবং β (বিটা) নামক দুই ধরনের চেইনের সমন্বয়ে। শরীরে এই দুই চেইন উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনের পরিবর্তন বা সংশ্লিষ্ট জিনের বিলুপ্তি হলে, এই চেইনগুলো তৈরি হতে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে গ্লোবিন তৈরিতে α এবং β চেইনের অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, কার্যকরী হিমোগ্লোবিন আর তৈরি হতে পারে না; যার কারণে লোহিত রক্তকণিকা পরিণতভাবে তৈরি হওয়ার আগেই ভেঙে যায়।

মানব দেহের স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন হলো হিমোগ্লোবিন A (HbA); যার গঠনে দুটি α (আলফা) চেইন এবং দুটি β (বিটা) চেইনের সমন্বয় থাকে। এখানে উল্লেখ্য, ভ্রূণ অবস্থা থেকে জন্মের পর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন F (HbF) থাকে রক্তের প্রধান হিমোগ্লোবিন। যা দুটি α (আলফা) চেইন ও দুটি γ (গামা) চেইনের সমন্বয়ে গঠিত। ছয় মাস বয়সের পর থেকে HbA রক্তের প্রধান হিমোগ্লোবিনের দায়িত্ব নেওয়া শুরু করে এবং HbF ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এক বছর বয়সের পর, স্বাভাবিকভাবে মানুষের শরীরে প্রায় সম্পূর্ণ HbA দ্বারা HbF প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। তাই ছয় মাস বয়সের পর থেকে থ্যালাসেমিয়া মেজরের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে। HbA-এর দুটি আলফা এবং দুটি বিটা চেইনের জন্য দায়ী জিনগুলোর অর্ধেক আসে মায়ের কাছ থেকে এবং অর্ধেক আসে বাবার কাছ থেকে। কোনো ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকলেই যে একজন ব্যক্তির মধ্যে থ্যালাসেমিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, বিষয়টা তেমন নয়। এটা নির্ভর করে জিনগুলো কতটা ত্রুটিপূর্ণ এবং তার কারণে নির্দিষ্ট আলফা কিংবা বিটা চেইনের সংখ্যায় কতখানি ঘাটতি তৈরি হচ্ছে তার ওপর। অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির শুধু একটি জিনের যদি ত্রুটি থাকে, তবে তার শরীরে সারাজীবনেও রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেই ব্যক্তি বাহক হিসেবে

পরবর্তী প্রজন্মে আক্রান্ত জিন পরিবাহিত করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, একজন বাহকের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক মানুষের বিয়ে হলে তাদের ছেলেমেয়েদের থ্যালাসেমিয়ার বাহক হওয়ার আশঙ্কা ৫০%। আবার, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ২৫% আশঙ্কা থাকে থ্যালাসেমিয়া মেজর-এ আক্রান্ত হওয়ার, ৫০% আশঙ্কা থাকে থ্যালাসেমিয়ার বাহক হওয়ার এবং মাত্র ২৫% আশঙ্কা থাকে স্বাভাবিক সন্তান জন্ম হওয়ার।

α এবং β চেইনের ঘাটতির ওপর নির্ভর করে থ্যালাসেমিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো–

* আলফা থ্যালাসেমিয়া এবং
* বিটা থ্যালাসেমিয়া

আলফা থ্যালাসেমিয়াতে α চেইন তৈরিতে ঘাটতি দেখা যায়। দুটি α চেইন তৈরির জন্য চারটি 'α গ্লোবিন জিন' ($4\alpha+$) জড়িত থাকে, যার দুটি আসে মায়ের কাছ থেকে, দুটি আসে বাবার কাছ থেকে। রোগের তীব্রতা নির্ভর করে কতগুলো জিনের অনুপস্থিতি আছে তার ওপর।

α° থ্যালাসেমিয়া: এখানে চারটি জিনই অনুপস্থিত, ফলে কোনো α° চেইনই তৈরি হতে পারে না। এটি সবচেয়ে গুরুতর অবস্থা এবং ভ্রূণ অবস্থায়ই শিশুর অ্যানিমিক হার্ট ফেইলিউরে মৃত্যু হয়।

$1\alpha^{+}$ থ্যালাসেমিয়া: এখানে শুধু একটি জিন কার্যকর থাকে। ফলে শতকরা ২৫ ভাগ আলফা চেইন তৈরি হয়। শিশু মারাত্মক রক্তশূন্যতায় ভোগে।

$2\alpha^{+}$ থ্যালাসেমিয়া: এখানে দুটি a globin gene সক্রিয় থাকে এবং এই কারণে শতকরা ৫০ ভাগ α চেইন তৈরি হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই শিশুদের মধ্যে কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হয় না এবং এদেরকে α-Thalassemia trait অর্থাৎ বাহক বলা হয়।

$3\alpha+$ থ্যালাসেমিয়া: এখানে তিনটি জিনই সক্রিয় থাকে এবং মোট α চেইনের শতকরা ৭৫ ভাগ তৈরি হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। এরা silent carrier হিসেবে জীবনযাপন করে।

বিটা থ্যালাসেমিয়াতে β চেইন তৈরিতে ঘাটতি থাকে। β চেইনের জন্য দুটি জিন দায়ী থাকে; যার একটি আসে বাবার কাছ থেকে এবং অপরটি মায়ের কাছ থেকে। বিটা থ্যালাসেমিয়া জিনের মিউটেশন এবং চেইনের কর্মক্ষমতা ভেদে তিন রকমের।

β-Thalassaemia major: এখানে মা-বাবার কাছ থেকে পাওয়া দুটি জিনেই পরিবর্তন ঘটে। β চেইন একেবারেই তৈরি হতে পারে না অথবা খুবই কম পরিমাণে তৈরি হয়। ফলে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন (HbA) তৈরি হয় না। আক্রান্ত ব্যক্তির তীব্র রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়, প্লীহা বড়ো হয়ে যাওয়াসহ অন্যান্য লক্ষণ প্রকট রূপ ধারণ করে এবং এদেরকে সারাজীবন রক্ত সঞ্চালনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই রোগীদের গড় আয়ু ৩০ বছর।

β থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া: এখানে দুটি জিনেই মিউটেশন ঘটে; কিন্তু জিনগুলো কিছু পরিমাণে কার্যকর থাকে ফলে β চেইন এবং পরবর্তীতে HbA কিছু পরিমাণে তৈরি হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ মাঝামাঝি ধরনের হয় এবং খুব বেশি রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না।

β থ্যালাসেমিয়া মাইনর / ট্রেইট/ ক্যারিয়ার: এই ধরনে শুধুমাত্র একটি জিনের mutation থাকার কারণে β চেইন এবং পরবর্তীতে HbA উৎপাদন মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে। হালকা রক্তস্বল্পতা থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে এদেরকে carrier অর্থাৎ বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আমাদের দেশে β-থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

বিটা থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কিছু কথা

β থ্যালাসেমিয়া মেজরের ক্ষেত্রে β চেইন তৈরি না হতে পারার কারণে যেসমস্ত α চেইন জোড় বাধতে পারে না, তারা 'toxic inclusion bodies' হিসেবে অপরিণত রক্তকণিকায় জমা হয় এবং এই কারণে রক্তকণিকাগুলো অকালেই অস্থিমজ্জায় ধ্বংস হয়ে যায়। বাকি রক্তকণিকাগুলো যারা অস্থিমজ্জায় ধ্বংস হওয়া থেকে বাদ পড়ে যায় তারা রক্ত সংবহনে চলে আসে এবং পরবর্তীতে প্লীহায় ধ্বংস হয়। প্লীহায় কাজের চাপ বাড়ে এবং এই বাড়তি কাজের ফলে প্লীহা বড়ো হতে থাকে।

যেহেতু রক্তকণিকা ভেঙে আয়রন মুক্ত হয়, সেই কারণে শরীরে আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর কারণে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, লোহিত রক্তকণিকা ঠিকমতো তৈরি হতে না পারায় শরীরে চরম রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং শরীরের টিস্যুতে অক্সিজেনের সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে। এই ঘাটতি পূরণ করতে তখন অস্থিমজ্জাসহ যকৃতেও লোহিত রক্তকণিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পরিবর্তিত অবস্থার কারণে লিভার বড়ো হতে থাকে; অস্থিমজ্জার ফাঁকা স্থানগুলো ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে। হাড়ের কর্টেক্স পাতলা হয়ে যায়, বড়ো হাড়গুলো ভঙ্গুর হতে থাকে এবং মাথার খুলি ও মুখের হাড়ে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়।

লক্ষণ

থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ নির্ভর করে নির্দিষ্ট গ্লোবিন চেইনের সংখ্যার ঘাটতির ওপর। সাধারণত ২ বছর বয়সের মধ্যেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণসমূহ হচ্ছে–

* মারাত্মক রক্তস্বল্পতা, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
* বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, দুর্বলতা
* বার বার ইনফেকশন হওয়া, কোনো রোগ হলে সারতে অনেক সময় লাগা
* লিভার বড়ো হয়ে যাওয়া,

* প্লীহা বড়ো হয়ে যাওয়া,
* হাড়ের পুরুত্ব কমে যাওয়া, হাড় সহজেই ভেঙে যাওয়া
* মাড়ি থেকে রক্ত পড়া, নাক থেকে রক্ত পড়া (প্লীহা অধিকমাত্রায় সক্রিয় থাকার কারণে)
* মানসিক অবসাদ
* শ্বাসকষ্ট (অ্যানিমিক হার্ট ফেইলিউর-এর কারণে)
* শরীরের বিভিন্ন স্থানে আয়রন জমে যাওয়ার কারণেও নানা জটিলতা তৈরি হয়। যেমন:

ডায়াবেটিস, লিভার সিরোসিস, হার্ট ফেইলিউর, হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যাওয়া, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, মৃগীরোগ, থাইরয়েডের সমস্যা, বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হওয়া।

অস্থিমজ্জা প্রসারিত হয়ে যাওয়ার কারণে খুলির ও মুখের হাড়ে পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন: কপালের হাড় ও উপরের চোয়াল সামনের দিকে বৃদ্ধি পায়, চোয়াল ও দাঁতের বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা, নাকের হাড় চ্যাপ্টা হয়ে যায় ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি

কিছু রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় করা হয়। যেমন–
* CBC (Complete Blood Count)
* PBF (Peripheral Blood Film)
* Serum Iron profile
* Haemoglobin electrophoresis

গর্ভাবস্থার ৮-১১তম সপ্তাহে থ্যালাসেমিয়া আছে কি না তা জানা সম্ভব কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে। সেগুলো হলো–
* Chorionic villous sampling
* DNA analysis
* Amniocentesis

চিকিৎসা

আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তস্বল্পতার মাত্রা এবং অন্যান্য লক্ষণ কী পরিমাণে রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত থ্যালাসেমিয়া মেজরে আক্রান্ত রোগীকে সারাজীবন রক্ত গ্রহণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন আঙ্গিকে চিকিৎসার জন্য (বিভিন্ন অঙ্গের জটিলতা থাকার কারণে) শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ (পেডিয়াট্রিশিয়ান), মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (সাইক্রিটিস্ট), রক্তরোগ বিশারদ (হেমাটোলোজিস্ট), ট্রান্সফিউশন বিশেষজ্ঞ, হরমোন বিশেষজ্ঞ (এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট) এবং নিউট্রিশন বিশেষজ্ঞের সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। থ্যালাসেমিয়ায় নিম্নরূপ চিকিৎসা দেওয়া হয়:

* রক্ত সঞ্চালন
* আয়রন চিলেশন
* স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন
* জিন থেরাপি
* স্প্রেনেকটমি (অপারেশনের মাধ্যমে প্লীহা কেটে বাদ দিয়ে ফেলা) এছাড়াও বিভিন্ন লাইফস্টাইল পরিবর্তনের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন–
* আয়রন সমৃদ্ধ খাবার পরিহার করা (যেমন লাল মাংস, কলিজা, কলা ইত্যাদি)
* ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া
* খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি খাওয়া, কারণ এতে আয়রন শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়
* ভিটামিন ডি, জিংক সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ইত্যাদি।

প্রতিরোধ

একটি কথা প্রচলিত আছে– Prevention is better than cure। থ্যালাসেমিয়াও প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সচেতনতা। সমাজের প্রত্যেক মানুষকে সচেতন ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা রাখতে হবে এই রোগ সম্পর্কে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে হওয়াকে নিরৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে এর ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং মানুষকে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একটি ছেলে ও মেয়ের বিয়ের আগে প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। কেননা, অনেক থ্যালাসেমিয়ার বাহক (carrier) নিজেদের অজান্তেই এই রোগের জিন তার শরীরে বহন করে। এছাড়াও গর্ভাবস্থায়ও উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে ভ্রুণের থ্যালাসেমিয়া আছে কি না তা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

থ্যালাসেমিয়া একটি গুরুতর বংশগত রক্তরোগ, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয় সব ক্ষেত্রে। তাই প্রতিরোধই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রতিবছর ৮ই মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে; এই রোগ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, বিবাহ-পূর্ব স্ক্রিনিং, আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিরুৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় জেনেটিক কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার অনেকাংশে কমানো সম্ভব। পাশাপাশি, আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ চিকিৎসা, পুষ্টি ও মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্মিলিত সামাজিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত একটি সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

ডা. দীপান্বিতা মণ্ডল: ইন্টার্ন ডাক্তার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল

নদী ও নারী এবং হুমায়ুন কবীর

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ

মালেকের আর নূরুর সঙ্গে ঘর বাঁধা হলো না সব কিছুই বন্যার তোড়ে উড়ে গেল ভেসে গেল জীবন যেন এমনি নদী যেমন ধারা বদলায়, জীবনও কখনো-সখনো নিজেকে ধুয়ে-মুছে একাকার করে নেয়, হয়ত পরিশুদ্ধ করবার জন্য। মালেক যেন একটা সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নতুন টিলা, সেখানে আশ্রয় বাঁধা যায় না। কারণ সে যে অস্তায়মান, বড়ো প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও যে সরিয়ে দেয়। তা প্রমাণ হলো হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯)-এর *নদী ও নারী* (১৯৫২) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তিল তিল করে যে স্বপ্ন, যে আকাঙ্ক্ষা মনের নিভৃতে জমা হয়েছিল, মালেক আর নূরুর রক্ত সঞ্চালনে যে স্বপ্নবীজ রোপণ হওয়ার কথা, তা কাকতালীয়ভাবে ভেঙে গেল খান খান হয়ে একটা চিরসত্য বাণীতেই, তারপরও সত্য চিরন্তন, সত্যই সুন্দর সত্য এবং সুন্দর দুটোকেই মানুষ ভালো না বেসেও ভালোবাসে। সে সুন্দরের কাছে পৃথিবী থেকে হয়ত হোঁচট খায়, অথবা সঠিক পথেই চলে, মানুষ শুধু সত্যকে ভয় পায়। আসগর মিয়া কিন্তু সত্যকে চেপে রাখেনি, সত্যকে নদীর কাছে, নারীর কাছে উন্মোচিত করেছে। মালেক আমিনার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঘরের সন্তান, যে আমিনাকে নজুমিয়া বিয়ে করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে তালাক দেয় এবং পুরানো প্রেমিক ফুপাতো ভাই আসগরকে বিয়ে করে আমিনা এবং সেই আমিনার দ্বিতীয় স্বামীর ঘরের দিকের সন্তান নূরু, অর্থাৎ মালেক এবং নূরু একই মায়ের পেটের ভাই-বোন, যদিও বাপ ভিন্ন কিন্তু মাতৃদুগ্ধ তো আমিনারই গ্রহণ করেছে দুজন। চিরসত্য কথাটা শুনে মালেক এবং নূরু নিজেদের অন্য জগতে আবিষ্কার করল। এই আবিষ্কারের মধ্যে যন্ত্রণা এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের কবর রচনা। পাঠক শেষ অধ্যায়ে দেখল, মালেক চলে গেল বৃহত্তরের সন্ধানে, কে থাকে আর শূন্য মাঝারে। দুনিয়ার নীতিই এই যে ভাঙাগড়ার ভেতর বিকশিত হয় অন্য আরেক গল্প। *নদী ও নারী* উপন্যাসের মূল বিষয়টা আসলে এখানেই নিহিত। উপন্যাসটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রথম খণ্ড 'নজুমিয়া' (প্রথম খণ্ডে আটটি অধ্যায়), দ্বিতীয় খণ্ড 'আসগর'

হুমায়ুন কবির

জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬
কোমরপুর গ্রাম, ফরিদপুর, অবিভক্ত বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ)

মৃত্যু : ১৮ আগস্ট, ১৯৬৯

নির্বাচিত রচনাবলি

- স্বপ্নসাধ (কবিতা)
- সাথী (কবিতা)
- নদী ও নারী (উপন্যাস)
- ইমানুয়েল কান্ট (১৯৩৬)
- শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২)
- বাংলার কাব্য (১৯৪৫) (সমালোচনা গ্রন্থ)
- মার্ক্সবাদ (১৯৫১)
- মীর্জা আবু তালিব খান (১৯৬১)
- Poetry, Monads and Society (1941)
- Muslim Politics in Bengal (1943)
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৫)
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (প্রবন্ধ)

[সংশোধিত]

(দ্বিতীয় খণ্ডে আটটি অধ্যায়), তৃতীয় খণ্ড 'নূরু ও মালেক' (তৃতীয় খণ্ডে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে) এবং নূরু ও মালেকের শেষ অধ্যায়ে আরেকটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ের কাহিনিমালা পাঠককে টেনেছে, গল্পের যে গতি তা থেকে বিচ্যুতি হয়নি কখনো।

দার্শনিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)-কবি-কথাশিল্পী হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে তেমনভাবে কোনো আলোচনা হয় না বললেই চলে, যদিও তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের (ফরিদপুর জেলার) মানুষ। তার সার্থক উপন্যাস *নদী ও নারী* বিস্মৃতপ্রায় বলা যায়।

উপন্যাসে তিরিশ-চল্লিশ দশকের চিত্ররূপ-আবহাওয়া স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। হুমায়ুন কবীর গ্রামীণ প্রেম এবং অপ্রেম বা সামাজিক সংঘাতের মতো বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে *নদী ও নারী* উপন্যাসের বীজ বপণ করেন, যেখানে পদ্মা নদীর উপস্থিতি গভীরভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে কাহিনি এগিয়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। পদ্মাপাড়ের মানুষের জীবিকার পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের যে সংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার তাগিদে কঠিন পেশায় নিয়োজিত, সর্বোপরি সংঘাত-প্রেম-দ্বেষ এবং মানবিকতা ফুটে উঠেছে *নদী ও নারী* উপন্যাসের একেকটি চরিত্র হয়ে উঠেছে একেকটি অতি মানব। এখানে মৃত্যু আছে এবং অবধারিতভাবে মৃত্যু একটা সাধারণ বিষয় হলেও জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে জীবন চলমান নদীর মতো বহমান প্রতিনিয়ত। কঠিন বিপদের সময়েও মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে জীবনের কথা ভাবে, নতুন চরের মতো নতুন জীবন তাকে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জোগায়। নদী পার হয়ে মানুষ যেমন সমুদ্রে যেতে চায়, সমুদ্রও নদীকে কদাচিৎ হাতের নাগালে পেয়ে একটু ঝাঁকুনি দেয়, হয়ত বুকে তুলে নেয়। নজুমিয়ার মা আয়েষার একমাত্র অবলম্বন নাতি মালেকই ছিল যক্ষের ধন নাতিকে ছাড়া যেমন তার একদণ্ডও কাটে না, তেমনি মালেকেরও দাদিকে ছাড়া জীবন যেন অন্ধকার। এই ভালোবাসার মধ্যে মাতৃস্নেহ যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অনেক না বলা গল্প। পদ্মা নদীর স্রোতরাশির মতোই তাদের একে-অপরের নিবিড় সম্পর্ক, কেউ কাউকে ছাড়া অচল। নজুমিয়াও মাকে এতটাই ভালোবাসে এবং সম্মান করে যে কখনো তাকে উপেক্ষা করবার চিন্তাও করে না, সমস্ত রকম আদেশ-নির্দেশ মান্য করে বরাবর। উপন্যাসটিতে গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মূলত এই তিনজনই প্রধান, কেউ কারো চেয়ে ছোটো নয়, যেন সবাই প্রধান। তারপরও কাজের লোকের বা পারিপার্শ্বিক আরো বেশ কিছু চরিত্র *নদী ও নারী* উপন্যাসে ভিড় করেছে, তাতে কাহিনি আরো বেগবান হয়েছে বলতেই হয়। নজুমিয়া খণ্ডের অধ্যায়ে পাঠক বিভিন্ন চড়াই-উতরায়ের ভেতর দিয়ে একটা গন্তব্যে পৌঁছে যায়, আয়েষাকে কখনো মনে হয়ে বৃক্ষ আবার কখনো সে হয়ে উঠেছে পদ্মা নদীর একটা শাখা, যার বুকের দুটো ধন, দুটো নয়নমনি, ছেলে এবং নাতি। রহিমপুরের এই নজুমিয়া এক বৈশাখ মাসের শেষে ঝড়ের তাণ্ডবে রাক্ষুসী পদ্মা নদীর গহ্বরে হারিয়ে যায় যখন খবরটা এসে আয়েষার কানে পৌঁছালো ধুলদির অন্য আর সব মানুষের মতোই স্তম্ভিত হয় গেল সেও। পদ্মা নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়ে সে ছেলেকে সন্ধান করতে চাইল। দুঃখ-শোকে আয়েষা সত্যসত্যিই এক মাঝরাতে পদ্মার বুকে ঝাঁপ দিয়ে বুকের জ্বালা চিরতরে মেটালো। তারপর থেকে মালেক হয়ে গেল অনাথ কিন্তু এই অনাথ বালক মালেকের ভার কে নেবে, কুলসুম বা বসির চাচা কত দিন আর মালেক বা মালেকের বাপের বিষয়-সম্পত্তি আগলে রাখতে পারে, তারপরও মালেক যে একমাত্র

উত্তরাধিকার পূর্ব চরের জমির প্রজার বিলি বন্টনের টাকা দিতে চায় না, যার কারণে পূর্ণিমার খাজনা শোধ হয় না দিনে দিনে খাজনার পরিমাণ বাড়তে থাকে, বসির চাচা-কুলসুমের কাছে যা ছিল অবশিষ্ট সবই চলে যায় একে একে, এমনকি আয়েষার সোনাদানাও বিক্রি করতে হয় খাজনা শোধ করতে। অবশেষে মালেক এবং নজুমিয়ার বিষয়-সম্পত্তি একদিন নজুমিয়ার চিরশত্রু আসগরের হাতে সঁপে দেয়, কারণ পঞ্চায়েত প্রধান নজুমিয়ার মৃত্যুর পর রহিমপুরের পঞ্চায়েত প্রধান হন আসগর তার অর্থ-ক্ষমতা-যশ-খ্যাতি সবই বেশি, আর সে কারণে গ্রামবাসী আসগরকেই মালেকের দায়দায়িত্ব দেয়।

এই আসগরের মেয়ে নূরুকে পাঠক মালেকের শৈশব-কৈশোরের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। তাদের জীবন যেন ছকে বাঁধা মালেক এবং নূরুর মা যে আসগরের বিবি আমিনা, এখানেই উপন্যাসটিকে বহুমাত্রায় নিয়ে যায়। পদ্মাচরের ভাঙা জমি ভেঙে রহিমপুরের গ্রাম এবং নূরু এবং মালেককে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়েছে যে নারী, সেই আমিনাকে ধীর-স্থির একটা প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। নদী যেখানে রাক্ষুসী-উন্মুক্তা-পাগলপারা-সর্বগ্রাসী, সভ্যতাকে ভেঙে চলে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে, অথচ আমিনা একটা নারী, তাকে যতই মাতৃত্বের পরিচয়ে বেঁধে রাখি না কেন, সে এমনই একটা নদী, যার ওপর অনেক স্রোত অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা চলে গেছে, তারপরও আমিনা নদীর মতোই অটল-শান্ত। হয়ত নদীর সঙ্গে নারীর একটা মিলের সেতুবন্ধ রচনা করতে চেয়েছেন হুমায়ুন কবীর।

রহিমপুরের পঞ্চায়েত প্রধান আসগর মিয়ার দেখভালের মধ্যেই মালেক বড়ো হতে থাকে। আসগরের স্ত্রী আমিনা হাতে স্বর্গ পেল। তার পূর্বের স্বামীর ঔরশের সন্তান মালেক হলেও তারই যে জঠরের নাড়ি ছেঁড়া ধন, সে কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। আমিনার মন কানায় কানায় ভরে গেল। মালেককে দীর্ঘসময় পর কাছের পেয়ে সত্যিই সে আনন্দে আত্মহারা। নূরু-মালেক মানুষ হতে থাকে তারই চোখের সামনে। ভালোবাসা-আবদারে দুজন যেন একই বৃন্তে ফোটা দুটো ফুল হয়ে যায়। আমিনার মন শান্ত হয়। আমিনা যে দীর্ঘ অপেক্ষার পর মালেককে পেয়েছে তার জন্য শুকরিয়া জানায় আল্লাহর কাছে, নজুমিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রাপ্তি, তা হয়ত কখনো কামনা করেনি কিন্তু তারপরও পেয়ে যায়।

উপন্যাসের মানুষগুলো সত্যি সত্যিই নদীর মতো কখনো সরল এবং কখনো মনে হয়েছে নদীর মতোই বাঁকা। তিরিশের প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসু *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় লিখেছেন, *নদী ও নারী* উপন্যাসের পদ্মা বর্ষায় প্রখর, শরতে সুন্দর, কালবৈশাখির ঝড়ের সন্ধ্যায় ভয়াল, অপমৃত্যুর আধার, প্রাণের পালয়িত্রী– আবার সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে হঠাৎ বর্ষণে বন্যাস্ফীতা সর্বগ্রাসিনী। উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে পদ্মার সম্পর্ক সেভাবে চোখে পড়ে না। ভূমি এবং সামন্ততান্ত্রিক বিষয়াদি যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে এবং সম্পর্কের টানাটানি উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে, সম্পর্কের যে পালাবদল এবং ভাঙাগড়া যা সমাজজীবনে বহমান, তাই দেখাতে গিয়ে দার্শনিক তাকে বহুগুণে আশ্রয় দিয়েছেন। প্রেমের যে আলোক ঝলসানো দৃশ্যাবলি অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন, বুদ্ধদেব বসু তাতেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। হয়ত মন্তব্য করতে হয় বলেই মন্তব্য করা আর কী, দেশ-কাল পাত্র ভেদে মানুষ কী চায় এবং তার প্রকৃত ঘটনাকে সাহিত্যে তুলে আনাই হলো একটা বৃহৎ প্রাপ্তি। কিন্তু তারপরও অনবদ্য ভাষা, ভাষার যে শক্তি এবং নদী-মানুষ-প্রকৃতির যে একাকার হয়ে মিশে যাওয়ার ছবি দেখা যায়, তাতে উপন্যাসটির সরল আখ্যানে একটা দার্শনিক মাত্রা যোগ হয়েছে বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রথম দুটো খণ্ডে নদী ও নারীর বুনন যেভাবে চলছিল, তার প্রায় সবটুকুই ছিল ভূমি নির্ভর। শেষখণ্ডে দেখা গেল সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা। অবশ্যই নদী তো আপন বেগে পাগলপারা, তার শেষ গন্তব্যস্থল সমুদ্র, সেখানেই সে মিশবে, সেখানে সে তার আপন অস্তিত্ব খুঁজে নেবে। কাহিনির পটভূমিটিও রহিমপুর থেকে ক্রমে বন্যা-দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্রবেলার বিরানচরে সরে এসেছিল, যে চরে নতুন বসতি সৃজিত হয়েছিল, নদীতীরবর্তী মানুষ তো সংগ্রামী, প্রকৃতির দুর্যোগকে ভয় করে না। বার বার ভাঙে আবার গড়ে, আবার ভাঙে তারপরও গড়ে তোলে বসতি-সমতল। নতুন চরে নতুন ভূমিতে ফসল ফলায় শ্রম দিয়ে, শক্তি দিয়ে তাকে কে বাঁধিবে, কে বা রুখিবে নদীর মতোই নদীতীরবর্তী বাসিন্দারাও তো চলমান-বেগবান। হুমায়ুন কবীরের *নদী ও নারী* ভাববাদী মানবতা-চাঞ্চল্য জীবনদৃষ্টির শিল্প প্রতীমা উপন্যাসে সার্থক সর্বজ্ঞ সহানুভূতি বর্ধিত হয়েছে সচ্ছল কৃষিজীবীদের প্রতি জীবনাচরণের দৃষ্টিতে কৃষক হলেও সম্পত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা উন্মোচিত হয়েছে তাদের সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। তারপরও বলতে হয় হুমায়ুন মূলত নবজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাবসত্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে তাদেরই মনের কথাকে গল্পে-গল্পের আখ্যানে স্থান করে দিয়েছেন, যা একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের করণীয়, এ জন্যই তিনি বাংলাসাহিত্যের সার্থক রূপকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, নদী এবং নারী যে আমাদেরই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা তো কখনো অস্বীকার করা যাবে না, সেই সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ *নদী ও নারী*। বাংলা সাহিত্য বা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে উপন্যাসটি একটি অলংকার এবং অহংকার, যা হয়ত কখনো ফুরোবার নয়, পদ্মা নদী, এই সেই পদ্মা নদী বাংলা সাহিত্যে বাংলাভাষী বা বাংলাদেশের নানা রূপবৈচিত্র্য বারংবার ঘুরেফিরে এসেছে নারীর মতো, কখনো রাগে আবার কখনো অনুরাগে। পদ্মা পাড়ের নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাগাধুনিক জীবনের ছাঁচ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় পদ্মার মতো খেয়ালি নদীর সহচার্যে, কেমনভাবে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে যাপনের ভরকেন্দ্র, তারই আখ্যান হুমায়ুনের *নদী ও নারী* উপন্যাস, পদ্মার জলপদ্যে যেখানে আঁকা হয়েছে লোকায়েত জীবনের সরল বর্ণালি।

আশরাফ উদ্‌দীন আহ্‌মদ: লেখক ও প্রাবন্ধিক

মুন্সিগঞ্জে সারাটা দিন

চান্দ্রেয়ী পাল মম

এক মাস ধরে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়েছি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তাই ভাবছিলাম কোথাও ঘুরে আসি। ঢাকার আশপাশে একদিনে ঘুরে আসার মতো বেশ কিছু জায়গা রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঘোড়াশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মাওয়া এবং আরো অনেককিছু। ঠিক করলাম মুন্সিগঞ্জ যাবো।

বন্ধুদের জানালাম, যেদিন যাবো তার দুদিন আগে বাবা-মাকেও বললাম। অনেকদিন আমাদের পরিবারের চারজন কোথাও যাইনি। বাবা-মাও রাজি হয়ে গেলেন। সকাল সকাল সবাই রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম।

প্রথমেই যেতে হবে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে বন্ধুরা সবাই চলে আসল। আমরা ৮ জন স্বাধীন বাসে উঠে রওনা দিলাম প্রথমে শ্রীনগরের দিকে। বাস ভাড়া ছিল ৯০ টাকা করে। ঢাকা পেরোতে খুব একটা সময় লাগল না। রাস্তাটা ছিল খুবই সুন্দর। যারা মাওয়া গেছেন তারা রিলেট করতে পারবেন হয়ত। চারপাশ একদম সবুজ। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নেমে গেলাম শ্রীনগরের বেজগাঁও এলাকায়।

এখানে একটা ছোট্ট সমস্যা হয়েছে। সাধারণত আমি কোথাও যাওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ট্র্যাভেল গ্রুপের বেশ কিছু পোস্ট এবং গুগল ঘাঁটাঘাঁটি করে যাই। এবারও তাই করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কিছু ভুল থাকায় আমরা প্রথমেই শ্রীনগর যাই, যেখান থেকে আসলে মুন্সিগঞ্জ শহর বেশ অনেকখানি দূর। যাই হোক, কোনো বিষয়ই না। আমরা একটা টমটম ঠিক করে কাছাকাছি দুটো স্পটে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম গন্তব্য লেখক হুমায়ুন আজাদের বাড়ি। তার পুরাতন এবং নতুন দুটো বাড়িই সেখানে রয়েছে এবং তিনি শায়িত আছেন বাড়ির প্রাঙ্গণে। গাছপালায় ঘেরা পুকুরের ধারে খুব শান্ত একটা জায়গা। সমাধিটি একদম বইয়ের আকারে তৈরি। এটা দেখতে খুব ভালো লাগল। আমরা সবকিছু দেখে কিছুক্ষণ বসে বের হয়ে এলাম। এরপর চলে গেলাম স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউটে। অনেক বড়ো এরিয়া। প্রথমেই ঢুকে হাতের বামে ছোট্ট একটা ঘর। জাদুঘরের মতো অনেক জিনিসপত্র ও পেইন্টিং সাজানো। সেখান থেকে বের হয়ে সামনে এগিয়ে বড়ো মাঠ, হাতের বামে একটা বাড়ির দরজা, মন্দির। আরেকটু সামনে গিয়ে বিশাল এক দিঘি। সেখানে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। এত শান্তি আর আরাম। পুরোটা জায়গায় প্রচুর গাছপালা।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা পৌঁছালাম শ্রীনগর বাজারে। লক্ষ্মী নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে মিষ্টি, দই, কালোজাম, জিলাপি খাওয়া হলো। গরম গরম জিলাপি খেয়ে খুব ভালো লাগল। সবসময় শুনে এসেছি বিক্রমপুরের ঘোল সেরা। কিন্তু আমি কখনো ঘোল খাই না। খুব একটা ভালো লাগে না। বাবা আর অভিজিৎ দুটো অর্ডার করার পর বাবার কাছ থেকে সিঁথি নিয়ে একটু টেস্ট করল। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, নাহ একবার খেয়েই দেখি। আহা! সেই স্বাদ আমার এখনো মনে আছে।

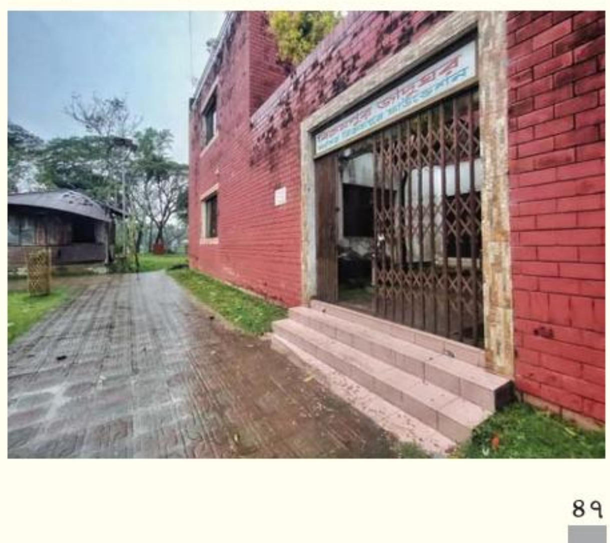

একটু বিটলবণ আর লেবুর রস মেশানোর কারণে ঘোলের স্বাদ অন্য লেভেলে চলে গেছে। অসম্ভব মজা। আরো কয়েকটা চটজলদি বলা হলো। মনে হলো স্বর্গ হাতে পেলাম। ভরপেট এবং মনের শান্তি করে খাওয়াদাওয়া করে আবার টমটমে চড়ে বসা।

এবার গন্তব্য মুন্সিগঞ্জ। অনেক লম্বা পথ। প্রায় ২৮ কিলোমিটার। প্রায় দুই ঘণ্টার বেশি সময় লাগল আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছাতে। পুরোটা রাস্তা আমরা খুব গল্প করলাম। অনেক হাসি-আড্ডা হলো। বহুকিছু নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হলো। অংকিতা কী মিষ্টি করে গান গাচ্ছিল সঙ্গে বাইরের সবুজে মোড়া আর পিচঢালা পথ ছিল মনোমুগ্ধকর। একটা খুব সুন্দর বিষয় যেটা সেটা হলো, পুরোটা এলাকায় প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা করে পুকুর আছে। আক্ষরিক অর্থে প্রতিটা বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গায় পুকুর করা। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগল আমার এবং সারাদিন ব্যাপারটা আমি খেয়াল করলাম। আবার এই এলাকার বাড়িগুলোর ধাঁচ একদম আলাদা। রঙিন টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি দোচালা, চারচালা বাড়িগুলোর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিফট করা যায়। অর্থাৎ জোড়া খুলে পুরো বাড়িটিকে মানুষ আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। একটা-দুটো ভ্যানে করে আমরা দেখলামও বাড়ির জোড়া খুলে নিয়ে যেতে। এক জায়গায় ছিল অনেকগুলো তৈরি বাড়ি। বাবা দেখালো সেখান থেকে মানুষ বাড়ি কিনে নেয়। কী মজার একটা ব্যাপার। বাড়িগুলো দেখতেও খুব সুন্দর।

দুপুর তিনটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম ইদ্রাকপুর কেল্লায়। মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইদ্রাকপুর কেল্লা অবস্থিত। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সেনাপতি ও বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬০ সালে বিক্রমপুরের এই অঞ্চলে ইদ্রাকপুর কেল্লা নামের এই দুর্গটি তৈরি করেন। মূলত মগ জলদস্যু ও পর্তুগিজদের আক্রমণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্গটি তৈরি করা হয়। মূল দুর্গের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে কিছুদূর হেঁটে হাতের ডানে একটা পুকুর আর বামে সিঁড়ি উঠে গেছে দুর্গের চূড়ায়। পুকুরের ঘাটে নেমে কয়েকজন একটু ফ্রেশ হয়ে নিলো। আর আমি উঠে গেলাম উপরে। গোলাপি রঙের কেল্লাটি দেখতে খুব সুন্দর। কিছু ছবি তুলে রাখলাম। রোদ তখনও অনেকখানি চড়ে আছে। কিছু সময় কাটিয়ে নেমে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটি জাদুঘর। সেখানে মুন্সিগঞ্জ শহরের ইতিহাস এবং স্থাপনাগুলো সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা দেওয়া আছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় এবং এই দুর্গে প্রাপ্ত বেশ কিছু জিনিসও রাখা আছে। ভেতরে ফোন ও ক্যামেরা নেওয়া যায় না। একটুখানি দেখে বের হয়ে এলাম।

কেল্লা প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আমরা একটু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম যে এরপর কোথায় যাওয়া যায়। আমার মাথায় ছিল সোনারং জোড়া মঠ। জায়গাটা কেল্লা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটারের পথ। তবে প্রথম কিছুক্ষণ গুগল ম্যাপে জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দুটো রিকশা দরদাম করে উঠে পড়লাম। যেতে থাকুক। যাওয়ার সময় পথের সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। প্রচুর গাছপালার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, রোদ গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়ছে।

গ্রামের রাস্তায় মানুষজন টুকটাক কাজ করছে। মাঝে একটা বড়ো গাছ দেখলাম হালকা সবুজ ফুলে ভরে আছে। কিন্তু আমরা ফুলের নাম জানি না। রিকশা থামিয়ে একটা ছবি তুলে নিলাম গাছটার।

৪০/৫০ মিনিট পর আমরা পৌঁছালাম গন্তব্যে। দূর থেকে দেখেই মাথাটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। সোনারং জোড়া মঠ মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে অবস্থিত। মূলত এটি জোড়া মন্দির। বড়ো মন্দিরটি কালীমন্দির ও ছোটো মন্দিরটি শিবমন্দির। দুটো মন্দিরই এত্ত সুন্দর আমি লিখে বোঝাতে পারব না। একদম পাশাপাশি দুটো মন্দিরে পুরোটাজুড়ে পোড়ামাটির কাজ। বড়ো মন্দিরটির উপর দিকে অনেকগুলো ছোটো ছোটো খোপ খোপ করা। এই খোপগুলোতে পাখির বাসা রয়েছে যার কারণে প্রচুর পাখি মন্দির দুটোর মাঝে উড়াউড়ি করছিল। আমরা ঘুরঘুর করছিলাম। টুকটাক ছবি তুলছিলাম, এর মধ্যে একটা সেরা ব্যাপার হয়ে গেল। হুট করেই আকাশ কালো হয়ে উঠল। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে, চারপাশের সবগুলো গাছের পাতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। খোপগুলোর আশপাশে উড়তে উড়তে পাখিগুলো সব কিচিরমিচির শুরু করল। বৃষ্টি আসার আগের মুহূর্ত আমার খুব পছন্দ। বুক ভরে ঠান্ডা বাতাস নিতে নিতে পুরোটা সময় উপভোগ করলাম। কিন্তু অবাক করা বিষয়, বৃষ্টি হলো না। শুধু আবহাওয়াটা ঠিক এমনই রইল।

জোড়া মঠের কাছেই ছিল অতীশ দীপঙ্করের বাস্তুভিটা। আমরা রিকশা নিয়ে সেখানে চলে গেলাম। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলেন একজন প্রখ্যাত মহাপণ্ডিত, যিনি পাল সাম্রাজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখন সেখানে অতীশ দীপঙ্করের পণ্ডিতভিটা ও অডিটোরিয়াম অবস্থিত। জায়গাটায় যে কী অদ্ভুত শান্তি। মূল একটি প্যাগোডা মন্দির সোনালি রঙের, ভেতরে একটি কালো পাথরের মূর্তি। চারপাশে প্রচুর রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগ বাতাসে উড়ছে। গাছপালা, ফুল বাগান। এক-দুজন মন্দির প্রাঙ্গণের মানুষ ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। আর ছিল একটা সুন্দর কুকুর। মনে হচ্ছিল আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। ওকে একটু আদর করে আমরা বের হলাম।

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো জলপথে লঞ্চে করে ঢাকা ফিরব। একই রিকশা করে আমরা মুন্সিগঞ্জঘাটে চলে গেলাম। রোজার সময়, ঠিক মাগরিবের আজানের আগ মুহূর্তে রিকশা ছেড়ে দিয়ে কাছের এক খাবার হোটেলে গিয়ে বসা হলো। বাহিরে একদম নীরব। ঠান্ডা বাতাস, গোধূলি সন্ধ্যা। কিছু খাবার অর্ডার করে আমরা খেয়ে নিলাম। সবাই ক্ষুধার্ত ছিল। পেটপুজো শেষে আমরা লঞ্চের টিকিট করে নিলাম। ডেকের ভাড়া খুবই কম ছিল। ৪০ টাকার মতন। এরপর লঞ্চ জার্নিটা ছিল বেশ রিল্যাক্সিং। সারাদিনের পর আরাম করে আমরা ছাদে বসে ঠান্ডা বাতাস খাচ্ছি, গল্প করছি টুকটুক করে, আকাশে কাস্তের মতো চাঁদ। নদীতে নানান রকম নৌকা আর জাহাজের আলো। এত্ত ভালো লাগছিল। সদরঘাট পৌঁছে আলো, ভিড় দেখছিলাম। ততক্ষণে শরীরে ক্লান্তি এসে ভর করেছে কিছুটা। বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে এসে কয়েকজনকে বিদায় দিলাম। এরপর বাসে উঠে বাসার দিকে চললাম। ভাবছিলাম, এমন সুন্দর আনন্দের দিন বার বার আসুক।

চান্দ্রেয়ী পাল মম: প্রাবন্ধিক

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসইভাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে একদিনব্যাপী ‘উচ্চশিক্ষা রূপান্তরে জাতীয় কর্মশালা’ উদ্বোধন করেন। তিনি ১২ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট উপহার দেন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আয়োজিত এ কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য ‘বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার রূপান্তর: টেকসই উৎকর্ষের রূপরেখা।’ এতে সরকারের নীতিনির্ধারক, ইউজিসির সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক, গবেষক, কূটনীতিক শিল্প খাতের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা অংশ নেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

নিরাপদ মাতৃত্ব সকল নারীর অধিকার

জান্নাতুল ফেরদৌস

মাতৃত্ব! অদ্ভুত এক অনুভূতি। একজন নারীর জীবনের পূর্ণতা পায় সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। এ যেন নারীর জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা যা তাকে দেয় সৃষ্টির আনন্দ। সন্তানের হাসিতে খুঁজে পায় সে পৃথিবীর সকল সুখ। একজন মা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে দশ মাস দশ দিন একটি শিশুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে শিশুটিকে পৃথিবীর মুখ দেখান। এরপর শত ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে পরম আদর-যত্ন-ভালোবাসায় শিশুটিকে বড়ো করে তোলেন। নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হয়। মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সাল থেকে এ দিবসটি পালন করে আসছে। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগতমান সম্পর্কে মা, পরিবার ও সমাজের সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করাই আন্তর্জাতিক নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের মূল লক্ষ্য। মায়ের সুস্থতার ওপর নির্ভর করে সন্তানের নিরাপদ জন্ম ও সুস্থ জীবন। তাই মায়ের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা– ডব্লিউএইচওর মতে, একজন মা গর্ভাবস্থা, প্রসব অবস্থা ও প্রসব-পরবর্তী ৪২ দিনের মধ্যে মারা গেলে ঐ ঘটনাকে 'মাতৃমৃত্যু' হিসেবে গণ্য করা হয়। সংস্থাটি বলছে, প্রসবজনিত জটিলতায় সারাবিশ্বে প্রতিদিন ৮০০ মাতৃমৃত্যু হয়। মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ হলো– বাল্যবিবাহ, ২০ বছরের নিচে সন্তান নেওয়া, প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি, বিলম্বিত প্রসব ও ঠিকমতো প্রসব করতে না পারায় ইনফেকশন প্রভৃতি। অন্যদিকে কম ওজন নিয়ে জন্ম, প্রি-ম্যাচিউর, জন্মের পরপর শ্বাস না

নেওয়া ও নাভিতে ইনফেকশনের কারণে নবজাতকের মৃত্যু হয়। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কমাতে হলে এখাতে দক্ষ জনবল বাড়াতে হবে।

একজন গর্ভবতীকে গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। মা ও গর্ভের শিশুর সুস্থতার জন্য একটু বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে গর্ভের সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য আমিষ জাতীয় খাবার, যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ও দুধ বেশি করে খেতে হবে। এছাড়া সবুজ, রঙিন শাকসবজি, ফল ও যেসব খাবারে আয়রন বেশি আছে যেমন– কাঁচাকলা, পালংশাক, কচু, কচুশাক, কলিজা ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খেতে হবে এবং রান্নায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে। অনেকেরই ধারণা, মা বেশি খেলে পেটের বাচ্চা বড়ো হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক প্রসব হবে না। কিন্তু এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়, বরং মা বেশি খেলে মা ও গর্ভের বাচ্চা উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মা প্রসবের ধকল সহ্য করার মতো শক্তি পায় এবং মায়ের বুকে বেশি দুধ তৈরি হয়। গর্ভকালীন সময়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু কিছু কিছু ভারী কাজ যেমন– কাপড় ধোয়া, পানি ভর্তি কলস কাঁখে নেওয়া, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি করা মোটেও উচিত নয়।

গর্ভকালীন সময়ে যা করণীয়

১. গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪ বার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা মা ও শিশু হাসপাতালে এসে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে।
২. গর্ভধারণের ৪ থেকে ৮ মাসের মধ্যে মাকে ২ ডোজ টিটি টিকা নিতে হবে।
৩. স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
৪. প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।
৫. ভারী কাজ ছাড়া অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম করা যাবে।
৬. দিনের বেলায় কমপক্ষে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে।
৭. গর্ভবতী মাকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে হবে।

গর্ভকালীন বিপদ চিহ্ন, যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে

১. গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা পরে খুব বেশি রক্তস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, প্রসবের পর গর্ভফুল না পড়া।
২. মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা ও গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা পরে শরীরে পানি আসা।
৩. ৩ দিনের বেশি জ্বর থাকা।
৪. প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি থাকা ও প্রসবের সময় শিশুর মাথা ছাড়া অন্য কিছু আগে বের হওয়া।
৫. গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা পরে খিঁচুনি হওয়া।

নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনার জন্য করণীয়

১. কোথায় কাকে দিয়ে প্রসব করানো হবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখা।
২. রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে আগে থেকে ২-৩ জন রক্তদাতা ঠিক রাখতে হবে।
৩. জরুরি অবস্থায় গর্ভাবতীকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৪. প্রসবকালীন খরচের জন্য গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় টাকা জমিয়ে রাখতে হবে।

সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়লে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সব শ্রেণির মানুষ এই অধিকার পাবে, তাহলেই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন সার্থক হবে। নারীর জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হোক এবং সংরক্ষিত হোক নারীর অধিকার– এটাই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের প্রত্যাশা।

জান্নাতুল ফেরদৌস: প্রাবন্ধিক

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উদ্বোধন

'আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ -এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ১০ই মে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মাঠে বার্ষিক প্যারেড অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চারদিনব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী একটি লাল-সবুজ খোলা জিপে চড়ে পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট ও পতাকাবাহী দলের সুশৃঙ্খল, দৃষ্টিনন্দন ও বর্ণাঢ্য প্যারেড পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বক্তব্য রাখেন। এ সময় পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদান ব্যাকগ্রাউন্ড উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়। এবারের বার্ষিক প্যারেডে অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বিএনপি সরকারের আমলে এটিই প্রথম পুলিশ সপ্তাহ।

বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশের অতিরিক্ত আইজিগণ, বিভিন্ন মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, জেলার পুলিশ সুপারসহ নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছেন। পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচি ১৩ই মে পর্যন্ত চলে।

প্রতিবেদন: শ্রেয়সী শ্যামা

ভালোবাসার অপর নাম ‘মা’

আফফান হোসেন

এ পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও মধুর শব্দের নাম ‘মা’। ছোট্ট এ শব্দের অতলে লুকানো থাকে গভীর স্নেহ, মমতা আর অকৃত্রিম দরদ। মা শব্দটিতে যে পরিমাণ ভালোবাসা মিশে আছে তা আর কোনো শব্দেই নেই। কবির ভাষায়—‘মা কথাটি ছোট্ট অতি কিন্তু যেন ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রিভুবনে নাই।’ পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াময় মুখ মায়ের। মায়ের জন্য ভালোবাসা অকৃত্রিম, চিরন্তন ও অনাবিল। জন্মের পর প্রথম মায়ের স্পর্শ পেয়ে দেহ-মনে শিহরণ জাগে মানব দেহের। পৃথিবীর সভ্যতার উত্থান-পতনের যত গল্পই বলা হোক না কেন মায়ের জন্য ভালোবাসার গল্পটি সব সময় একই মমতায় মাখা থাকবে। মায়ের হাসি মুখের তুলনা চলে না অনুভূতির ভাণ্ডারে জমে থাকা কোনো আনন্দ বা সুখের সঙ্গে। অজস্র দুঃখ-বেদনার ঝড় সামলে রাখা সেই মমতাময়ীকে ভালোবাসার জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণের প্রয়োজন নেই। তবুও সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার সন্তানরা তাদের মায়েদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। মা দিবসটা একটি বিশেষ দিন যেদিন সব মায়েদের এবং যারা মায়েদের মতো, তাদের সম্মান জানানো হয়।

এ বছর ১০ই মে ২০২৬, রবিবার বিশ্ব মা দিবস। বিশ্বজুড়ে এ দিবসটি পালিত হয় এবং কোথাও কোথাও এর পরিচিতি মা-ময় রবিবার হিসেবে। জীবনের প্রতিটি দিনই সন্তানের জন্য মা দিবস। সন্তান ও মায়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, এত দৃঢ় আর কোনো সম্পর্ক এই পৃথিবীতে নেই। মা দিবসের মূল বার্তা হলো—মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও স্নেহের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ভ্রূণ থেকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে যে মা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান, সেই মায়ের সম্মানে তারই চরণে এ দিনে নত তাবৎ পৃথিবীর সন্তানেরা। মায়ের জন্য প্রতিদিনই সন্তানের ভালোবাসা থাকে। তবুও আলাদা করে একটু ভালোবাসা জানাতেই এ দিনটি।

মা দিবসের ইতিহাস অনেক পুরানো। মধ্যযুগে এক চর্চা চালু হয়েছিল যে, যারা কাজের জন্য যেখানে বড়ো হয়েছেন সেখান থেকে চলে গিয়েছেন, তারা আবার তাদের বাড়িতে বা মায়ের কাছে এবং ছোটোবেলার চার্চে ফেরত আসবেন। সেটা হবে খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসব লেন্টের চতুর্থ রবিবারে। সেসময় ১০ বছর বয়স থেকেই কাজের জন্য বাড়ির বাইরে চলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাই এটা ছিল সবাই মিলে পরিবারের সঙ্গে আবারও দেখা করার ও একসাথে সময় কাটানোর একটা সুযোগ। এভাবে ব্রিটেনে এটা মায়ের রবিবার হয়ে ওঠে। যেহেতু লেন্টের তারিখ পরিবর্তিত হয়, তাই এই রবিবারও নির্দিষ্ট থাকে না।

আধুনিক যুগে মা দিবসের উৎপত্তি যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে প্রতি বছরের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালিত হয় এটি। এই চিন্তাটা প্রথম আসে ফিলাডেলফিয়ারের আনা জারভিসের মাথা থেকে। তিনি ১৯০৭ সালের ১২ই মে তার মাকে নিয়ে এক ছোট্ট স্মরণসভার আয়োজন করেন। আনা জারভিসের মা নারীদের একসঙ্গে করে বন্ধুত্ব ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতেন। মায়েদের সন্তান মানুষ করাটা যে অনেক পরিশ্রমের কাজ সেটা সবাইকে জানাতে চেয়েছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্র্যাফটনে আনা জারভিসের মা, আনা রিভস জারভিস মায়েদের একটা ‘ডে ওয়ার্ক ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন যার লক্ষ্য ছিল শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনা। কারণ মিজ জারভিস নিজেও তার নয়টি সন্তান হারিয়েছিলেন। তিনি মারা যান ১৯০৫ সালের ৯ই মে। আর তার স্মরণসভার জন্য আনা জারভিস ১২ই মে বেছে নেন কারণ ওটাই ছিল তার মা মারা যাবার কাছাকাছি একটা রবিবার। তার মা যে চার্চে যেতেন সেখানে তার মার উদ্দেশে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান করেন। ১৯০৭ সালে আনা জারভিস তার মাকে নিয়ে স্মরণসভা করার পরের বছর থেকে আস্তে আস্তে অন্যান্য জায়গাতেও মা দিবস পালিত হতে থাকে। ১৯১০ সালে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়, আর ১৯১৪ সালে তো পুরো আমেরিকা জুড়েই এটি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। এরপরের পাঁচ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সবকয়টি রাজ্যে মা দিবস পালনের চল শুরু হয়। আর ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এ দিনটাকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতিবছরের মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস পালন হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার পাশাপাশি মা দিবস এখন বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, রাশিয়া, জার্মানসহ শতাধিক দেশে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

মা দিবস বিশ্বজুড়ে বছরের বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ঋতুতে পালিত হতে দেখা যায়। ইথিওপিয়াতে বর্ষার শেষে ও শরতের শুরুতে

তিন দিনব্যাপী এক উৎসব হয়—অ্যানট্রোস্ট, এটি ঘিরেই এখানে পালিত হয় মা দিবস। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে পরিবারের সব সদস্যরা একসাথে মিলিত হয়, একসাথে সবজি, চিজ আর মাংস মিলিয়ে একটা খাবার প্রস্তুত হয়, এরপর সবাই মিলে এক সাথে নাচ-গান করে। জাপানে আগে প্রতিবছর ৬ই মার্চ মা দিবস পালন করা হতো। কারণ এদিনটা সম্রাজ্ঞী কোজুনের জন্মদিন। তবে ১৯৪৯ সাল থেকে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটিকে। এসময় মা দিবসে মূলত সেইসব মায়েদের সান্ত্বনা দেওয়া হতো যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সন্তানকে হারিয়েছে এবং প্রথাগতভাবে এইদিন তাদের বিভিন্ন রঙিন ফুল উপহার দেওয়া হতো। মেক্সিকোতে মা দিবসকে বলা হয় 'দিয়া দে লাস মাদরেস', যা ১০ই মে পালিত হয় এবং দিনটি ঘিরে ব্যাপক আয়োজন হয় সেখানে। এদিনে সবাই তার মাকে খেতে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টে। সেখানে বিভিন্ন মেক্সিকান ব্যান্ডদল তাদের বিখ্যাত জন্মদিনের গান 'লাস মানিতাস' পরিবেশন করে। এছাড়া বিশ্বজুড়ে এদিন ঘিরে দেশে দেশে নানান বাণিজ্যিক আয়োজনও থাকে।

বাংলাদেশে এই দিনটি ঘরোয়া পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। সন্তানরা মায়েদের ফুল, উপহার ও ভালোবাসার বার্তা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন কবিতা, ছবি ও স্ট্যাটাসের মাধ্যমে। মা দিবসে সন্তানরা মাকে উপহার দেওয়ার পাশাপাশি তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ফ্যাশন ও গিফট হাউসগুলো দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা ধরনের উপহারের পসরা সাজিয়ে থাকে। এছাড়াও রেস্টুরেন্টগুলোতে থাকে মা দিবস উপলক্ষ্যে নানা ধরনের অফার।

মা দিবসের মূল বার্তা হলো মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ত্যাগ ও স্নেহের প্রতি সম্মান জানানো। এই দিনে আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিকে মনে করি, যিনি আমাদের প্রথম শিক্ষক, অভিভাবক ও বন্ধু। আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, যার মা আছে, সে কখনোই গরিব নয়।

'মা'—এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সব মায়ামমতা, অকৃত্রিম স্নেহ, আদর, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সব সুখের কথা। চাওয়া-পাওয়ার এই পৃথিবীতে বাবা-মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা চলে না। মায়ের তুলনা মা নিজেই। মায়ের মতো এমন মধুর শব্দ অভিধানে দ্বিতীয়টি আর নেই। নদীর তলদেশে তো যাওয়া যায় কিন্তু মায়ের ভালোবাসার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। 'মা' যেন সীমার মাঝে অসীম। পৃথিবীর সব ধর্মেই মায়ের মর্যাদাকে উচ্চাসীন করেছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।

মায়ের স্পর্শেই সন্তান ধীরে ধীরে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। ৩৬৫ দিনের প্রতিটি সেকেন্ডেই মনে করতে চাই 'মা' শব্দটিকে। মা, আম্মা, আম্মি, মাম্মি— সন্তানেরা যে যেভাবে ডাকুক; এই শান্তির ডাক শত কিছুর বিনিময়েও অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। বিভিন্ন ভাষাভাষীর সন্তানের কাছে 'মা' ডাক শব্দটি কতই না আপন। প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন হয় না। বয়স যতই হোক না কেন মায়ের কাছে সন্তান সবসময়ই ভালোবাসার। পৃথিবীতে হাজার হাজার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে পারে, কিন্তু সবশেষে আমরা একজন মানুষকেই খুঁজে পাই, যাকে আমরা শত আঘাত দেওয়ার পরেও সে শুধু আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবেন, আমাদের ভালো থাকা নিয়ে ভাবেন, আর তিনি হলেন— মা। মা হচ্ছে সন্তানের আদর্শ বিদ্যানিকেতন। মায়ের আদর অতুলনীয়। মা হতে গিয়ে যে মারা যায় ইসলামে তাকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছে। মায়ের ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। মায়ের জন্য রইল ভালোবাসা চিরন্তন, অনাবিল।

আফফান হোসেন: প্রাবন্ধিক

সরকারের ৩৪ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প গ্রহণ

বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে ১৩ই মে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় পদ্মা ব্যারেজ মেগা প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। দেশের প্রধান নদী ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার, লবণাক্ততার আগ্রাসন হ্রাস, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সরকার ৩৪ হাজার ৪৯৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে 'পদ্মা ব্যারাজ (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০৩৩ মেয়াদে প্রকল্পটি শতভাগ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

একনেক সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানী বলেন, এটি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা এবং প্রায় ৭ কোটি মানুষ উপকৃত হবে। পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে, খুলনা, ঢাকা, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের ১৯টি জেলা এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে হিসনা-মাথাভাঙ্গা, গড়াই-মধুমতি, চন্দনা-বারাশিয়া, বড়াল ও ইছামতীসহ প্রধান নদী ব্যবস্থার প্রবাহ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার। এছাড়া সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে লবণাক্ততা কমানো, সুন্দরবনের জন্য মিঠাপানির সরবরাহ নিশ্চিত করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, যশোরের ভবদহসহ জলাবদ্ধতা নিরসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূ-গর্ভস্থ জল পুনঃসঞ্চয়ন এবং আর্সেনিক দূষণ কমানোর লক্ষ্যও রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জি-কে) সেচ প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম, মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেচ সুবিধা বাড়ানো হবে। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিকল্পিত ভূমি উন্নয়ন এবং নগরায়ণেও প্রকল্পটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: রিসান হাসান

কাঁটা ও কাঁটা

মনি হায়দার

—রাকিব? তুমি কোথায়?

নিচে, লাইব্রেরিতে স্যার।

আমার রুমে আসোতো একটু... লাইন কেটে দেন আসরার আদনান। ভয়ানক ভাবনায় পড়ে রাকিব হাসান। কেন ডিরেক্টর স্যার ফোন দিলেন? তাও আট-নয় মাস পরে। আমার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাবেন কি? ভাবতে ভাবতে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে সিঁড়িতে পা রাখে। ঝোঁকের মাথায় ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিল রাকিব- একটা সাহসের কাজ করেছি। বুঝিয়ে দিয়েছি, ক্ষমতা থাকলেই সব মানুষ কেনা যায় না।

কিন্তু দুদিন পরেই ভাবনাটা উল্টো দিকে টার্ন নেয়, কাজটা ঠিক করলাম? আসরার আদনান ডিরেক্টর। আমি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা মাত্র। আমার ছয় ধাপ উপরের বস, তার মুখের উপর...

ভাবতে গিয়ে নিজের ভেতরে ওলটপালট অবস্থা। নিজের হাত কামড়ায়, কেন স্যারকে ওসব বলতে গেলাম। এখন কি মাফ চাইব? রাতে নিজের রুমে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, সকালে গিয়ে স্যারের কাছে ক্ষমা চাইব। একটু হালকা লাগে রাকিবের সিদ্ধান্তটা নিতে পারায়। ডিরেক্টর স্যারকে যতটুকু চেনে নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। কিন্তু সকালে এসে আসরার আদনানের রুমের সামনে গিয়ে নিজেকে খুব ছোটো মনে হলো রাকিবের।

স্যার যদি উপহাস করেন? যা বলার তো বলেছি, ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ডিজিকে বলে আমাকে ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার করতে পারেন- এইতো শাস্তি। ট্রান্সফার করলে মেনে নেব। না, স্যারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। নিজের মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রুমে চলে আসে রাকিব।

রাকিব হাসানের অফিসটা সরকারি। সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স পাস করে অনেক ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছে রাকিব কিন্তু কোথাও নিজের মতো করে স্থিতু হতে পারেনি। পত্রিকায় চাকরি করেছে তিন বছর, কিন্তু পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেলে বেকার রাকিব হাসান ঢাকা শহরে অনেক ঘুরেছে একটা চাকরির জন্য। এলাকার পরিচিত এক বড়ো ভাইয়ের হাত ধরে ঢুকেছিল একটা টিভি চ্যানেলে। কিন্তু মাস চারেক যাওয়ার পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। দিন নেই রাত নেই- নায়ক আর নায়িকাদের পেছনে পেছনে ছোটো। তারা কী খায়, কী পছন্দ করে খোঁজ রাখো এবং একই বক্তব্য নানা আঙ্গিকে প্রচার কর, বিরক্তির এক শেষ। চাকরি ছেড়ে চেষ্টা করেছে টিউশনির। কিন্তু তথৈবচ।।

তাহলে কি আমাকে দিয়ে কিছু হবে না? মেসের রুমে শুয়ে শুয়ে নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করছে রাকিব। কী করবে কোথায় যাবে ভেবে উঠতে পারছিল না। বৃদ্ধ পিতার ঘাড়ে সিন্দাবাদের মতো চাপতে রাজি নয়। হঠাৎ বাবা অসুস্থ হলে কুষ্টিয়া যায়। যাওয়ার সময়ে বাসে দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহতাব খানের সঙ্গে। পাশাপাশি সিট হওয়ায় স্যারের একটু সেবাযত্নও করেছে রাকিব। মাহতাব খান কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন একটা সেমিনারে। যেতে যেতে রাকিবের চাকরিবাকরির খবর নিয়ে সব জেনে বললেন, তুমি ঢাকায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা কর। বাসার ঠিকানাও দিলেন।

রাকিব কার্ড নিলেনও খুব ভরসা করেনি। অতীতের অভিজ্ঞতায় জেনেছে- প্রথমে আগ্রহ নিয়ে কার্ড দিলে পরে কিছু করে না। বরং বাসায় গেলে বিরক্ত হয়েছে অনেকে। মানুষের দ্বৈততার খেলাটা এখন বোঝে রাকিব হাসান। কার্ডটা পকেটে রেখে দেয়।

বাবা সুস্থ হলে ঢাকায় আসলেও মাস খানেক মেসে ঝিম মেরে

ছিল রাকিব। এমন নিদাঘ সময় মানুষের জীবনে আসে- যখন নিজেকেই নিজের ভালো লাগে না। হাতে খুব বেশি টাকাপয়সাও নেই, যা আছে কয়েকদিন চলবে। টাকাটা ফুরিয়ে গেলে কী করবে? কী খেয়ে বেঁচে থাকবে? মাস শেষে মেসের টাকা কে দেবে? নানামাত্রিক ভাবনায় জারিত রাকিব বিছানা ঝাড়তে গিয়ে মাহতাব খানের কার্ডটা পায়। বিকেলে কার্ডটা নিয়ে মাহতাব খানের ওয়ারীর বাসায় গেলে প্রকৃতপক্ষে ভালো অভ্যর্থনা পায়। মাহতাব খান রিটায়ার্ডের টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন। ছেলেও ভালো চাকরি করে- বৃদ্ধ বয়সে এখন সভা সেমিনার করে বেড়ান।

চা-নাস্তার পর মাহতাব খান বলেন, রাকিব তুমি কালকে আবদুল গণির সঙ্গে দেখা কর। তোমার ব্যাপারে আমি ওকে বলে রেখেছি। গণি আমার প্রথম দিকের ছাত্র। গেলে একটা উপায় হবে তোমার। গণি এখন খুব ক্ষমতাবান মানুষ। আমার ধারণা, তোমার একটা কাজ হবেই।

পরের দিন আবদুল গণির সঙ্গে দেখা করলে জিজ্ঞেস করলেন,
—সিভি এনেছ?

—এনেছি।

দাও। আবদুল গনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তবুও মনোযোগ দিয়ে সিভি দেখলেন। দু-একটা প্রশ্নও করলেন। টেবিলের ফাইলের স্তূপের মধ্যে সিভি রেখে দিয়ে বললেন, এই মাসের শেষ সপ্তাহে দেখা কর।

রাকিব হাসানের মনে হয়, আবদুল গণি ওর সঙ্গে একটা ঠান্ডা ধরনের নাটক করছেন। মনে হচ্ছে, এই মাসের শেষ দিকে আসলে একটা ডুমুরের ফল হাতে দিয়ে বলবেন, গ্রামের বাড়ি যাও। অনেকতো ঘোরাঘুরি করলে- এবার বাড়ি গিয়ে পেছনের পুকুরের পারে যে বেল গাছটা আছে, তার পাশে আমার দেওয়া এই ডুমুরের ফলটা লাগাও। দেখবে কয়েক মাস পর অঙ্কুরোদ্গম হয়ে বিশাল গাছ হবে। সেই গাছে অনেক ফল হবে, সেই ফল বিক্রি করে তুমি অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা দিয়ে তুমি একটা মুরগি কিনবে...।

এগারো-বারো দিনের নরক বাস করে রাকিব হাসান আবদুল গণির সঙ্গে দেখা করলে তিনি একটি নিয়োগপত্র ধরিয়ে দেন। নিয়োগপত্রটি অভিনব। অস্থায়ী নিয়োগ, প্রতি চার মাস পর পর আবেদন করতে হবে, আবার চাকরি চার মাসের জন্য কর্তৃপক্ষ দেবেন। কর্তৃপক্ষ সুযোগ মতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেবেন। রাকিব হাসান যখন নিজেকে ক্রমাগত পারদের তলানিতে নিয়ে গেছে, জীবন যখন অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল তখন এই নিয়োগপত্রটি নিয়ে এসেছিল অসহ্য স্বস্তি এবং আস্থা। নিজের ভেতরে আবিষ্কার করেছে এক ধরনের শক্তি।

যথারীতি চাকরিতে জয়েন করেছে রাকিব। প্রথম কাজই হয় ডিরেক্টর আসরার আদনানের দপ্তরে। এক একটি অফিসে অনেক প্রকারের দপ্তর থাকে। গ্রামের বাড়িতে মোবাইলে খবরটা দিলে বৃদ্ধ বাবা আনন্দে কাঁদলেন। মা আপ্লুত হয়ে মেয়ে দেখতে শুরু করেন। আদনান মানুষটা সহজ কিন্তু কখনো কখনো মচকে গেলে খুব বিপজ্জনক। রাকিবের খোঁজখবর নিয়ে বললেন, বিয়ে কর। বয়স হয়েছে।

—স্যার পাত্রী খুঁজছে মা।

—গুড।

রাকিবের সঙ্গে বিয়ের কথা বলার তিন-চারদিন পর আদনান ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মায়ের পাত্রী খোঁজার খবর কী?

—খুঁজছে, ছবি পাঠাচ্ছে কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না স্যার।

—আমার খোঁজে একটা মেয়ে আছে-আদনান বলেন।

—তাই নাকি স্যার?

—হ্যাঁ।

—মেয়েটি কী করে স্যার?

—চাকরি করে। বেসরকারি একটা ব্যাংকে। বেতন খারাপ না।
—যদি তোমাদের বিয়ে হয়, দুজনে মিলে চমৎকার চলে যাবে।

—কিন্তু মেয়েটি আপনার কী হয়?

—সেটা পরে জানলেও চলবে। গত কয়েক মাস তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কাজ করে আমার মনে হয়েছে তুমি দায়িত্বশীল মানুষ। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমি ফোন নম্বর দিতে পারি। দেব?

—দিন স্যার।

আদনান নিজের মোবাইল সেট থেকে নম্বর বের করে একটা কাগজে লিখে দেয়। সঙ্গে মেয়েটির নামও, লুনা। বেশ নাম, আপন মনে আওড়ায় নামটি। ওর সঙ্গে আলাপের রেজাল্ট আমাকে জানিও রাকিব।

—জানাবো স্যার।

নিজের টেবিলে এসে দেখতে পায়, উপ-পরিচালকের কাছে পাঠানো ফাইল ফেরত এসেছে। কেন?

ফাইল খুলে দেখতে পায়, উপ-পরিচালক সই করেনি। ছোট্ট একটা আলগা কাগজে লিখে পাঠিয়েছেন, আপনি নোট ফাইলে, বিশেষ করে যে ফাইলে টাকার লেনদেন থাকে, সেই ফাইলে সিগনেচার করবেন না। কারণ, আপনি আমাদের দপ্তরের স্থায়ী নন। আপনার পাশের লাজিনাকে দিয়ে সই করিয়ে ফাইল পাঠান।

লুনাকে নিয়ে একটা চিত্রকল্প বুকের গহীনে আঁকতে শুরু করেছিল রাকিব, ভাবছিল ফোন করে প্রথমে কী বলবে লুনাকে? লুনা, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দূর, শুরুতেই দেখা

করতে চাই, বলাটা ঠিক হবে না। বলব, আপনি লুনা বলছেন?

—হ্যাঁ, আমি লুনা বলছি। কিন্তু আপনি কে?

—আমি? রাকিব হাসান। এই কিছুক্ষণ আগে আপনার নম্বরটা আমাকে দিয়েছেন ডিরেক্টর আসরার আদনান।

—আমরা একই অফিসে চাকরি করি।।

লুনা হাসবে নিশ্চয়ই, বলবে- ও আচ্ছা। তো আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?

কিন্তু আমিতো চাকরি করি না। আমার এই চাকরি স্থায়ী না। যে-কোনো সময় কর্তৃপক্ষ বলতে পারে, কাল থেকে আপনার আসার দরকার নেই। অথচ একটা বিশাল অফিস। নিয়মিত আসছি, কাজ করছি কিন্তু আমার কোনো অধিকার নেই। আমি পরিত্যক্ত একটা কাগজ। সেই কাগজ, যাতে কোনো কিছু লেখা নেই। রাকিব সামনে ফাইলটা খুলে নাড়াচাড়া করে আর ভাবে, কী করব আমি? অ্যাডহকের চাকরি দেখতে দেখতে দেড় বছর হয়ে গেল। ডিজি স্যারের দেখা হলেও এতো মানুষ থাকে তাকে ঘিরে, আলাপ করার সুযোগ হয় না। রাকিবতো একা নয়, এক সঙ্গে নয়জন অ্যাডহকে নিয়োগ পেয়েছে। সবাই কাজ করছে অফিসে। কিন্তু প্রত্যেকের ভেতরে এক ধরনের গ্লানি কাজ করে। কাজ করছে ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানে আমরা কেউ না। আমরা বাইরের। আমরা পরগাছা। আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মাটি যে নেই রাকিব বুঝেছিল, আরও মাস আটেক আগে। পাশের একটা রুমে দুপুরের খাবার খায় অফিসের কয়েকজন। রাকিব বরাবরই বাইরে খায়। দোতলার রুমকি একটা কাজে হঠাৎ বাইরে গেলে ফোনে জানায়, রাকিব আমি বাইরে খাবো। আমি বাসা থেকে খাবার এনেছি। তুমি খেয়ে নিও।

খুশি হয় রাকিব, থ্যাঙ্কস।

রুমকিও অ্যাডহকে আছে। চাকরির নানা বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথা হয়। একটা নৈকট্য আছে। রুমকির জামাই সচিবালয়ে ভালো চাকরি করে। তো রুমকির খাবারটা নিয়ে পাশের রুমে যায়। দেখে, আগেই সবাই খেয়ে গেছে। টেবিলে ময়লা। পিওন ওবায়দুলকে ডেকে টেবিলটা পরিষ্কার করতে বললে, ওবায়দুল কঠিন চোখে তাকায়- দিতাছি।

অপেক্ষা করছে রাকিব। কিন্তু ওবায়দুলের দেখা নেই। প্রায় মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ব্যালকনিতে দাঁড়ালে রাকিব দেখতে পায়, ওবায়দুল সিগারেট টানছে সহকর্মীর সঙ্গে আর হি হি হাসছে। মেজাজ চড়ে যায় রাকিবের, একটু ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আমি ভাত খাবো। তোমাকে বললাম টেবিলটা পরিষ্কার করতে। না করে তুমি এখানে আড্ডা মারছ? ব্যাপারটা কী?

-হোনেন স্যার, আমরা অ্যাডহকের কাম করি না।

রাকিবের ইচ্ছে হলো মরে যায়। ওবায়দুলের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গের কলিগ তাড়া দেয়,

—ওবায়দুল এইডা ঠিক না। তুই স্যারের কামডা কইরা দে।

ওবায়দুল ঘাড় নিচু করে চলে যায়। ওই দিনের, ওবায়দুলের মন্তব্য- 'আমরা অ্যাডহকের কাম করি না' দীর্ঘদিন করোটির ভেতরে সুঁইয়ের মতো গেথে ছিল। ক্ষমতা এমন এক তরবারি যার নিচে গেলেই কেটে যায়। রক্তপাত কেউ দেখে না। ক্ষমতার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল কিন্তু ব্যবধান কোটি কোটি কিলোমিটার। আর একবার তিক্ত প্রমাণ পেল নিজের জীবনে, যখন ঘনিষ্ঠ হলো লুনার সঙ্গে।

অপমানের বিষ হজম করে লুনাকে পরের দিন ফোন করে। দীর্ঘক্ষণ রিং বাজলেও রিসিভ করে না। মনটা খারাপ হয়। আবার রিং করে। দ্বিতীয় টোন হবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে, হ্যালো?

—লুনা বলছেন?

—বলছি। আপনি কে?

—আমি রাকিব হাসান। আদনান স্যার আপনার ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লুনার কণ্ঠস্বরটা বেশ নরম হয়ে আসে, দুলাভাই বলছিল আপনি ফোন করতে পারেন। কিন্তু আমিতো খুব ব্যস্ত। আপনি কি চারটায় বা সাড়ে চারটায় আমাকে ফোন দিতে পারবেন?

—অবশ্যই পারব।

ঠিক আছে, আমরা তখনই কথা বলব। বাই বাই শব্দটা সুরের সঙ্গে শেষ করে লুনা। একটা ভালো লাগার অন্য রেশ রয়ে যায় রাকিবের অস্তিত্বজুড়ে। বিকেলে ফোন করে দুজনে টিএসসিতে দেখা করে। লুনা খুব আকর্ষণীয় নয় কিন্তু অস্বীকার করার মতোও নয়। বেশ চুল। কথায় তুখোড়। পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কথা হয়, কার কোন সিনেমা ভালো লাগে তালিকা করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে দুজনে। প্রতি রাতে ফোনে হিসাব ছাড়া কথা বলতে থাকে। সেইসব কথায় ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন, সন্তান, ফ্ল্যাট কেনার পরিকল্পনা- সবই থাকে। আর অফিসের পর প্রায়ই দুজনে দেখা করে।

লুনার সঙ্গে সংযোগের পর আসরার আদনানের সঙ্গে রাকিবের সম্পর্কটা আরো কাছাকাছি আসে। অফিসের অনেক কাজ ওকে দেয়। অনেক সমস্যা শেয়ার করে। রাকিবকে আগের চেয়ে একটু প্রশ্রয়ও দেয়। লুনার কাছেই জেনেছে, আসরার হচ্ছে চাচাতো দুলাভাই। লুনার সঙ্গে বিয়ে হলে আদনান হবে ভায়রা। অফিসে একটা প্রভাবও বাড়বে। আসরার আদনানের চাকরি আছে এখনও আট বছর। শোনা যাচ্ছে ডিজিও হতে পারেন। সরকারের উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো, হলে তো পোয়া বারো। রঙিন স্বপ্নে যখন রাকিব বিভোর ঠিক সেই সময়ে কেটে যায় রঙিন সুতো।

হঠাৎ লুনার দিক থেকে যোগাযোগ কমে আসে। ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না রাকিব। ওর অফিসে যেতে এক প্রকার নিষেধই করেছে। ফোনতো করেই না। রাকিব ফোন দিলে নানা ধরনের বাহানার প্রসঙ্গ তোলে। আসরার কাছে ঘটনার কোনো ক্লু পাওয়া যায় কি না ভেবে রুমে গেলে আসরার জানায়- রাকিব সবই ঠিক আছে। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছে-

—কী ঘটনা স্যার?

আমিও নিজে প্রথম দিকে অতটা গুরুত্ব দিইনি। তোমার ভাবি প্রায়ই বলত লুনার জন্য একটা ছেলে দেখতে। হাতের কাছে তোমাকে আমার যোগ্য মনে হয়েছে বলেই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছি। একটু থেমে আসরার বলেন, কিন্তু-

—স্যার কিন্তুটা কী?

—এখানে তোমার চাকরিটা অ্যাডহক, স্থায়ী নয় শুনে লুনা প্রবল রিঅ্যাক্ট করেছে। এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কোনো আলাপ হয়নি?

—না।

—তোমার ভাবিও দেখলাম লুনার পক্ষে। বোঝোইতো, মানুষ মাত্রই নিরাপত্তা চায়।

কিন্তু স্যার, আপনি তো জানেন আমাদের ইন্টারভিউ হবে সামনের মাসে, আহত গলায় বলে রাকিব।

—চাকরিটা আমার হবে- কনফার্ম।

—জানি। লুনাকে আমি যথেষ্ট বুঝিয়েছি। কিন্তু এই সময়ের মেয়ে, সব কিছুর আগে চায় আর্থিক নিরাপত্তা। তোমার চাকরি যদি স্থায়ী না হয়, তখন কী কী বিপদের সামনে পড়বে, যদি বিয়ে হয় তোমাদের মধ্যে-আমাকে এক এক করে বারোটি বিপর্যয়ের ঘটনা বলছে, বুঝতেই পারছ।

—ঠিক আছে স্যার!

রুম থেকে চলে আসে রাকিব হাসান। বুকটা হাহাকারে ভরে গেছে। এমনও মানুষ হয়? একজন নারী প্রেম গড়ে তোলে পুরুষের চাকরির স্থায়ীত্বের ওপর ভর করে? অ্যাডহকের চাকরি তাই প্রেম প্রত্যাহার করে নিয়েছে? অস্বীকার করেছে গত কয়েক মাসের সম্পর্ক! মানুষ কি মানুষের উপর নির্ভর করে না? নিজের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা তৈরি হয় রাকিবের। চারদিনের ছুটি নিয়ে চলে যায় কক্সবাজার। সমুদ্র তীরে অবগাহন করে এক ধরনের স্থিতি নিয়ে ফিরে আসে ঢাকায়। আশ্চর্য, রাকিব হাসান আগের চেয়ে কথা বলা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। প্রায় কারো সঙ্গে কথা বলে না। রুমে চুপচাপ থাকে। মেসেও চুপচাপ। নিঃশব্দে, দাঁতে দাঁত চেপে সময় পার করছে এবং সকল জটিলতার অবসান ঘটিয়ে অ্যাডহকের ঝুলন্ত পেন্ডুলাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন আবদুল গণি। নয়জনের সঙ্গে রাকিবকেও স্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর নিজেকে মানুষ মনে হলো। মুক্তির এবং স্বস্তির নিশ্বাসে বুকটা ভরে যায়। মাঝখানের জটিলতাকে অতিক্রম করে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আসরার আদনান অভিনন্দন জানিয়েছেন। নতুন উদ্যোমে কাজ করে যেতে বলেছেন। নতুন উদ্যোমে কাজ করে রাকিব হাসান।

সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার রুমে ডেকেছেন আসরার আদনান। অনেক কথা বলার পর আসল কথাটা বলেন তিনি, রাকিব তোমাকে একটা ভালো সংবাদ দিতে চাই। জানি, তুমি পছন্দ করবে।

—কী সংবাদ স্যার?

—লুনা এখনও তোমার অপেক্ষায় আছে। যা হবার হয়ে গেছে। তোমরাতো একে-অপরের কাছে এসেছিলে। স্মৃতি চাইলেই মুছে দেওয়া যায় না। আর বৃহত্তর জীবনের জন্য ছোটোখাটো ভুল ক্ষমা করে দেওয়াই ভালো। দু'দিন আগে লুনা বাসায় এসেছিল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়-

মুহূর্ত মাত্র, স্প্রিং মেশিনের গতিতে দাঁড়ায় রাকিব, স্যার কিছু মনে করবেন না। যেহেতু আপনার মাধ্যমে লুনার সঙ্গে আমার পরিচয়, আপনার মাধ্যমে সেই পরিচয়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে। এখন আমি আপনার মাধ্যমেই লুনাকে জানিয়ে দিতে চাই, লুনাকে আমি ঘৃণা করি।

—মানে?

—আমি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাসী। চাকরির স্থায়ীত্ব, ক্যারিয়ার আর টাকাপয়সার হিসাব দেখে আমি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ি না। আসি স্যার।

রাকিব দ্রুত রুম ত্যাগ করে। পাথরের ভঙ্গিতে বসে থাকে আসরার, ছেলেটাকে চিনতে ভুল হয়েছিল আমার। নিজের মনে স্বীকার করে নিলেন আদনান।

সেই ঘটনার পর আজ কেন ডেকেছেন আসরার আদনান? আমাকে কি ঢাকার বাইরে পাঠাবেন? নাকি লুনাকে বিয়ের জন্য চাপ দেবেন?

বিষণ্ণ মনে রুমে ঢুকলে আসরার বলে, বসো।

দাঁড়িয়ে থাকে রাকিব, ঠিক আছে স্যার।
—আরে বসো না! চা খাবে?
বসে চেয়ারে, স্যার চা খাবো না।
দুজনার মাঝখানে অস্বস্তিকর নীরবতা।

রাকিব, তোমার সেইদিনের প্রতিক্রিয়ায় আমি খুব আহত হয়েছিলাম। প্রচণ্ড রাগও হয়েছিল তোমার ওপর। কিন্তু দিন যত গেছে ঘটনা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। মনে হয়েছে, মাঝে মাঝে এভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় রাখা খুব জরুরি। তোমাকে অভিনন্দন।

প্রাণে বাঁচাও শ্রমিক
বাবুল তালুকদার

শ্রম দিয়ে কাজ করছে শ্রমিক বাঁচাও তবে
মানুষ তাদের মূল্য দিলে সুখ-শান্তি রবে।
দেশের সুনাম রাখছে ওরা সারা বিশ্বজুড়ে
অবহেলায় কত জীবন প্রাণ যাচ্ছে পুড়ে।

যুগ বহুযুগ কাটছে ওদের মানবতার সাথে
মানুষ নিয়ে ভাবছে তবে ভালো থাকে যাতে
গরিব-দুঃখীর ওপর কেন জুলুম সমাজপতি
শ্রমের মূল্য দেয় না কেউ নেই যে কোনো গতি।

কষ্ট করার পরেও ওরা কেন ভাতা পায় না
স্বার্থলোভী মানুষগুলো– দেয় না ওদের মায়না
দুঃখে জীবন যাচ্ছে সবার পায় না কোনো কূল
গরিব ঘরে জন্ম নেওয়া সবকি ওদের ভুল।

ঘাম ঝড়িয়ে কাজ করছে দেয় না ওরা ফাঁকি
হৃদয় থেকে ভালোবাসি যত্নে সবাই রাখি
কষ্ট করে সারা জীবন কাজকর্মে থাকে
জীবন যুদ্ধ প্রতিদিন-ই বলবে ওরা কাকে।

তাদের সাথে লড়াই হবে
রুস্তম আলী

যাদের ঘামে ফসল ফলে
যাদের ঘামে কলকারখানা চলে
যাদের ঘামে দেশ চলে
তাদের নিয়ে ভাবতে হবে।

শিশির ভেজা ললাট নিয়ে
ক্লান্ত দুপুরে দুটি রুটি পেট পুরে
বেলা শেষে মাথা গোজার ঠাঁই খুঁজে
ছোট্ট একটা কুঁড়ের ঘরে।
তাদের কথা ভাবতে হবে।

যাদের ঘামে সভ্যতার চাকা ঘুরে
যাদের ঘামে সংসার চলে
তাদের রক্ত শোষণ যারা করে।
তাদের সাথে লড়াই হবে।

লড়াই হবে, লড়াই হবে...
যারা শ্রমিক, কুলি, দিনমজুরের
ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
তাদের সাথে লড়াই হবে।

পশু কোরবান
জাহাঙ্গীর চৌধুরী

কোরবান হলো আল্লাহর নিকট
শুদ্ধ আত্মা বাছাই,
অন্তর তোমার কেমন শুদ্ধ
নিজে করো যাচাই।
পাপের বোঝা বহন করে
দেখাও সাধুর রংঢং,
কোরবান এলে বাহাদুর হও
পশু কিনে রংচং।
আত্মা যদি শুদ্ধ না হয়
কোরবান হবে বৃথা,
যে উদ্দেশ্যে কোরবান দিবে
আল্লাহর নিকট মিথ্যা।
মনের পশু নিধনের পর
পশু করলে কোরবান,
ঐ পশুটার রক্ত হবে
আল্লাহর কাছে মহান।
হালাল মাংস বণ্টন করে
গরিবদেরকে দাও,
আত্মীয়স্বজন সাথে নিয়ে
নিজেরাও খাও।
আত্মা হলে পরিশুদ্ধ
পাবে স্রষ্টার বন্ধন,
দুই জাহানে থাকবে তুমি
সাদা দুধের মতন।

তোমার নীল শাড়ি

লিলি হক

ব্রহ্মপুত্রের ডাকে গিয়েছিলাম সেদিন
দাঁড়িয়েছিলাম
কবিতা এসে বায়না ধরলো
সানন্দে বরণ করে নিলাম
তোমার সে কী হাসি প্রাণবন্ত উচ্ছলতা
নীল শাড়ির আঁচলে আকাশে
জান, নীলা সন্ধ্যায় নীলাকাশ আর
মিশে গেছে,
জানাই অপূর্ব মিশ্রণের জন্য।

জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালায়,
দুজনে সূর্যাস্ত দেখব বলে,
তাকে সঙ্গে নিতে হবে
সন্ধ্যার নীলিমায়।
পাশাপাশি বসেছিলে আর আকাশ
আমাকেই দেখছিলে, বললে
তোমার নীল শাড়ি কী অদ্ভুত
এসো না আমরা স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা

মায়ের দোয়া

মোহাম্মদ শরীফ

মায়ের মতো আপন ভবে কে আর আছে ভাই
মায়ের দরদ সেই-তো বোঝে মা যার বেঁচে নাই।
কেউ থাকে না গভীর রাতে পথের দিকে চেয়ে
ঐ যে আমার ছোটো খোকা আসবে কখন ধেয়ে।
নরম সুরে ডাকতো কত বাজান বাজান বলে
কষ্ট পেয়ে কাঁদতো মা, আমার একটু কষ্ট হলে।
অসুস্থ হলে বিছানার পাশে হাত বুলিয়ে মাথায়
দোয়া করতো দুহাত তুলে স্রষ্টার সুস্থ খাতায়।
নিজের কষ্ট কখনো মা বলতো না মুখ ফুটে
সন্তানের চিন্তায় সকল মায়ের রাত দিন শুধু কাটে।
এমন মা যার এখনো বেঁচে আছে ধরার বুকে
ভক্তি করো আদর করো মায়ের একটু দুঃখে।
দুনিয়া তোমার হবে শান্তির মায়ের দোয়ার তরে
পরকালেও থাকবে বন্ধু জান্নাতের সুউচ্চ ঘরে।

শ্রমিক

সুজিত হালদার

আমি আর কবিতায় কী লিখবো
যখন শ্রমিক আমার ভাই-বন্ধু-আপনজন
দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে
শ্রম ঘামে জবজবে শরীর নিয়ে রোজই
ঈশ্বর শব্দের আলিঙ্গন খোঁজে।

কিন্তু ঈশ্বর ওদের কখনো ধরা দেয় না
আলিঙ্গন দেয় না অব্যর্থ নিয়ন স্বপ্ন পূরণে
শুধুই ব্যঙ্গ করে সমাজ সংসার শিল্পপতির মতো
অবজ্ঞা ভরে কটাক্ষ করে সমস্বরে ধ্রুপদি ব্যঞ্জনা
তদুপরি শ্রম বিলিয়ে চলে নামগোত্রহীন শ্রমিক!

বেঁচে থাকা
ওয়াসীম হক

বেঁচে থাকা নয় শুধু নাক দিয়ে টানা শ্বাস
বেঁচে থাকা নয় শুধু সুখস্মৃতি ইতিহাস
জীবনের জলছবি রংতুলি মাখা নয়
শ্রমে ঘামে এক হয়ে সবটুকু আঁকা হয়।
এ পাহাড় এ সাগর তৃণঢাকা এই বন
চেয়ে দেখো প্রকৃতিকে এভাবেই হয় আপন
আমি দেখি কিছু শিখি হয়তো সে অল্প
বেঁচে থাকা মানে হলো চিরচেনা গল্প।

স্বপ্নের দিগন্তে মানুষ
বিচিত্র কুমার

মানুষের স্বপ্ন যেন দূরের দিগন্তরেখার মতো,
যেখানে আকাশ আর পৃথিবী একসাথে মিলিত হওয়ার ভান করে।
ইচ্ছা যেন অদৃশ্য বাতাসের মতো,
যা নৌকাকে এগিয়ে নিতে গোপনে শক্তি জোগায়।
পরিশ্রম যেন অবিরাম বৃষ্টির ফোঁটার মতো,
যা মাটিকে ভিজিয়ে সম্ভাবনার অঙ্কুর জাগায়।
ব্যর্থতা যেন ভাঙা আয়নার মতো,
যা সত্যকে টুকরো টুকরো করে দেখালেও দৃষ্টিকে শাণিত করে।
আর মানুষ যেন এক স্বপ্নচারীর মতো,
যে বাস্তবতার পথ পেরিয়ে নিজের দিগন্ত খুঁজে নেয়।

বছর কয়েক ধরে
আদিবা আবসারী

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
বিষণ্নতা বলে,
তার সঙ্গে আড়ি আমার
বছর কয়েক ধরে।

মেঘবালিকার মেঘকবিতা
করুণ ছন্দে চলে,
তার সঙ্গে আড়ি আমার
বছর কয়েক ধরে।

শেষ বিকেলের পাখিরা গায়
বিচ্ছেদের সুরে
তাই তো তাদের সঙ্গে আড়ি
বছর কয়েক ধরে।

স্তব্ধতাকে দাহ করে
দুঃস্বপ্নের সঙ্গ ছেড়ে
আশার মশাল সঙ্গী আমার
বছর কয়েক ধরে।

অতীতের সব বেদনার রং
শূন্যতা আজ দূরে
আপন রঙে রঙিন আমি
বছর কয়েক ধরে।

শেষ ট্রেনের অপেক্ষা

মামুন সরকার

কমলাপুর স্টেশন।

রাত প্রায় ১১টা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের বাতিগুলো হলদে পাতার মতো ঝাপসা। ক্ষণে ক্ষণে বৈরি বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট এসে যাত্রীদের গায়ে লাগছে। প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। এদিক-সেদিক দৌড়-ছুট করছে। কিছু তরুণ-যুবা দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে ওঠানামা করছে। আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ টোকাইয়ের কাছ থেকে চা-সিগারেট পান করছে। গরম চায়ের ধোঁয়া আর সিগারেটের গন্ধ মিলেমিশে অদ্ভুত একটা পরিবেশ।

ভেজা রেললাইন ঝিকমিক করছে ট্রেনের হেডলাইটের আলোয়। একটা ট্রেন ধীর লয়ে ঢুকে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে, আরেকটা ছেড়ে যায় ছয় নম্বর থেকে। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের পিলার ঘেঁষে এক কোণে। তার ট্রেন রাত বারোটায়। রুদ্র যাবে রাজশাহী। হাতের ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে চারদিকে চোখ ঘোরায়, একহাতে ধরা পুরানো মুঠোফোন। শরীরের পালস ধীরে চললেও বুকের ভেতর কিছু একটা ঘণ্টায় শত মাইল বেগে ছুটছে। এক তরুণীকে সামনে আসতে দেখে রুদ্রের চোখ আটকে যায়।

চার বছর আগের কিছু স্মৃতি সিনেমার মতো চোখের পর্দায় বিচ্ছুরিত হয়। চারটা ঋতু কম কিছু না, দীর্ঘ একটা সময়। চৌদ্দ শত ষাট দিবারাতের একটা মহাকাব্য। বুকের ভেতর একটা নাম হৃৎপিণ্ডের সাথে মিশে আছে। চোখের ফ্রেমে বাঁধা আছে পুষ্পের মতো ফুটফুটে কলেজ জীবনের প্রেমিকা সেতুর মুখচ্ছবি, যার নামটা চার চারটি বছর ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারেনি। হঠাৎ কোনোকিছু না বলে সেতুটা কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলো, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো ক্লু বের করতে পারেনি। বড়ো ভুলটা ছিল সেতুর কোনো ঠিকানা জানা ছিল না রুদ্রের। ভার্সিটির ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে প্রেম করেছে, কেউ কারো বাসাবাড়ির ঠিকানা রাখেনি। শুধু জানত সেতু তার এক খালার বাসায় থাকে। বাসা মগবাজার। আর রুদ্র থাকত শাহজাহানপুর রেল কলোনিতে। আজ অপরিচিতা তরুণীকে দেখে বুকের ভেতরে একটু কম্পন অনুভূত হয়। মনে হয় সেতুই তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

রাত সাড়ে এগারোটা বাজলেও প্ল্যাটফর্মে রাজশাহীগামী ট্রেন আসার নামগন্ধ নেই। কেউ কেউ বলছে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে ট্রেন আসতে খানিকটা সময় দেরি হবে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করতেই হঠাৎ মুঠোফোনে টিং করে একটা মেসেজ আসার শব্দ হয়। ওপেন করতেই ছোট্ট একটা টেক্সট চোখে পড়ে।

'আমি স্টেশনে। তোর সাথে দেখা করতেই এসেছি। যদি তুই অনুমতি দিস। তোর হারানো প্রেমিকা সেতু।'

সেতুর নাম দেখে রুদ্রের পালসে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গা হিম হয়ে আসে। কী ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারে না। যার সাথে দীর্ঘ চার বছর কোনো যোগাযোগ নেই সেই সেতু কি না বৃষ্টি ঝরা মাঝরাতে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। রুদ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সারা শরীর শীতকাটা দিয়ে হাত কাঁপতে থাকে। একটা অজানা অস্থিরতায় সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে যায়। পানির তেষ্টায় ঠোঁট শুকিয়ে আসে।

খানিক সময় চোখ বন্ধ করে নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করে। রুদ্রের সন্ধানী চোখ সেতুকে খুঁজে। সেতুও এক্সিট গেট অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে রুদ্রকে খুঁজতে থাকে। পরনে মেরুন রঙের সালোয়ার-কামিজ। মাথায় কালো হিজাব জড়ানো। স্টেশনের মিনমিনে আলোতে সেতুর মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনে হয়। হিজাব হালকা ভেজা। বৃষ্টিভেজা বৈরি বাতাসে গা একটু কাঁপছে সেতুর। একসময় দু'জন মুখোমুখি হয়। সেতু মুখ তুলে সরাসরি রুদ্রের চোখে চোখ রাখে। দীর্ঘ চার বছরের পাথর চাপা অভিমান, দুঃখকষ্ট আর অপেক্ষা এক মুহূর্তেই বরফের মতো গলে জল হয়ে ঝরে।

রুদ্র চোখের দৃষ্টি না সরিয়ে একটু কাঁপা গলায় জানতে চায়, সত্যিই তুই এলি? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

সেতু কোনো জবাব দেয় না। অপলক দৃষ্টি রুদ্রের দিকে। ঠোঁট মৃদু কাঁপছে, কিন্তু শব্দ বের হচ্ছে না।

একটা ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠে। কিছু যাত্রী ছুটাছুটি করে দ্রুত ট্রেনে উঠে পড়ে। তবু সেতুর দৃষ্টির সুতো টুটে না। সেতু ফিসফিস করে বলে, তুই রাজশাহী চলে যাচ্ছিস শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। এই স্টেশনে তোকে পাব ভেবেই এসেছি।

রুদ্র বলে, চার চারটা বছর তোর সাথে আমার দেখা নেই, কথা নেই, মোবাইলে কোনো যোগাযোগ নেই, আমি রাজশাহী চলে যাচ্ছি তুই জানলি কী করে?

সেতু বলে, আমি তোকে কষ্ট দিয়ে দূরে থাকলেও তোর মন থেকে পালাতে পারিনি।

—তাই বলে চার চারটা বছর কোনো যোগাযোগ থাকবে না। অন্তত একটা ফোন তো দিতে...

রুদ্র কথা শেষ করতে পারে না। সেতু কথা কেড়ে নিয়ে বলে, সে অনেক কথা রুদ্র। তুই কি সত্যিই রাজশাহী চলে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ, তুই যা শুনেছিস তা সত্যি। আমার একটা ভালো চাকরি হয়েছে। রাজশাহীতে পোস্টিং। আমার তো আর কেউ নেই যে তার অপেক্ষায় থাকব।

সেতুর ভেতরটা কেঁপে ওঠে। চোখের কোণে জল চিকচিক করে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সে বলে, তুই যদি চলে যাস, আমি বাঁচব কাকে নিয়ে। তুই জানিস না রুদ্র, আমি তো মরেই গিয়েছিলাম। শুধু তোকে পাবার আশায় বেঁচে আছি।

রুদ্র সেতুর কথার কোনো আগামাথা বুঝতে পারে না।

রুদ্রও একটা কষ্টের নিশ্বাস গোপন করে। হাজারো মানুষের ভিড়ের মাঝে তাদের দু'জনের মাঝখানে যেন একটা রেললাইন, যার দুই পাশে দুইটা হারানো মানুষ। রুদ্র বলে, আমি তো শুনেছি তোর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরসংসার নিয়ে ভালোই আছিস।

সেতু চুপচাপ। ওরা একটা বেঞ্চে বসে। বেঞ্চে তেমন লোকজন নেই। লম্বা হুইসেল বাজিয়ে রাজশাহীগামী ট্রেন এসে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। হুড়মুড় করে যাত্রীরা নামছে। রুদ্র ট্রেনের দিকে তাকায়। সেতু বলে, যা শুনেছিস সব মিথ্যে। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন জোর করে আমাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি রাজি হইনি বলে আমাকে অনেকটা গৃহবন্দি করে রাখা হয়। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের বাড়িতে। বাইরে যাওয়া নিষেধ। মোবাইলে কথা বলা নিষেধ। মোবাইল সিম ডিসকানেক্ট করা হলো। যার কারণে তোর সাথে আর যোগাযোগ করতে পারিনি।

তুই কি জানিস, আমি প্রতিদিন ফোন করতাম? দিনের পর দিন, রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও ফোন করতাম। অপর পাশ থেকে শুধু শুনতাম, 'এই নম্বর আর চালু নেই'। এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তোকে খুঁজিনি। কিন্তু তুই কোনোদিন একবারও খোঁজ করলি না।

—আমার সে সুযোগ ছিল না রুদ্র। আমাকে সবাই চোখে চোখে রাখত। কোথাও গেলে মা সাথে থাকত। আর মোবাইল না থাকলে যা হয়, আমার তাই হয়েছে।

—তা আজ কী করে জানলি আমি এখানে আছি।

কোনো কারণে বিয়েটা ভেঙে গেছে। গোপন সূত্রে বাবা জানতে পারল, ছেলে প্রবাসী হলেও তার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে ভেঙে গেলেও বাবা আমাকে আর ঢাকা আসতে দিলো না। শুধু অনার্স ফাইনাল দেওয়ার সুযোগ দিলো। পরীক্ষা দিলাম, পাসও করলাম। এখানে আমার শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটল। আত্মীয়স্বজন আরও কয়েকটা পাত্রের খোঁজ দিয়েছিল কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি। আজ এক সপ্তাহ হয় বাবা-মা'র সাথে খালার বাসায় এসেছি। বাবা হার্টের রোগী। চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার বলেছে দুটো রিং পরাতে হবে। সেদিন তোর বন্ধু সজলের সাথে দেখা। সজলই তোর সব ইনফরমেশন দিয়েছে। আজ রাত বারোটায় তোর ট্রেন তাও বলেছে।

—তা এত রাতে এখানে যে এলি তোর বাবা-মা কি জানে?

—না। না বলে এসেছি। শুধু তোর হাতটা ধরব বলে।

কিছু সময়ের জন্য রুদ্রের কথা থেমে যায়। তার চোখের ভেতর গাঢ় বিষণ্ণতা। একবার সেতুর মুখের দিকে তাকায়, আবার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের দিকে তাকায়। রাজশাহীগামী রাতের শেষ ট্রেনে যাত্রীদের ওঠানামার কাজ শেষ। প্ল্যাটফর্মে মানুষের তেমন একটা ভিড় নেই। কিছু ঠিকানাহীন মানুষ ঘুরাফেরা করছে। কেউ কেউ সুবিধামতো জায়গা খুঁজে বিছানা পাতছে। সারাদিনের ক্লান্তির চোখ দুটো বুজার জন্য।

রুদ্র বেঞ্চ থেকে উঠে ধীর পায়ে ট্রেনের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাথে সেতুও আসে। মাইকে ঘোষণা শোনা যায়, আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজশাহী এক্সপ্রেস পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে যাবে। সেতু ধরা গলায় বলে, তুই কি সত্যিই চলে যাবি?

—চার বছর তোকে হারিয়ে মরার মতো বেঁচে আছি। চাকরিটা হারালে বাঁচার আর কোনো পথ থাকবে না।

—আমিও তোর সাথে বাঁচতে চাই রুদ্র।

রুদ্র কষ্টমাখা কণ্ঠে বলে, না রে সেতু। আমি আর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চাই না। স্বপ্ন মানুষকে বড়ো কাঁদায়। তুই তোর বাবা-মা'র অবাধ্যে কিছু করিস না। তোর বাবা হার্টের রোগী। আমার সাথে তোর সম্পর্কটা মেনে নিতে পারবে না। তাছাড়া তুই তো জানিস আমার কোনো ঠাঁই-ঠিকানা নেই। আমার মা মারা যাওয়ার পর বাবা আরেকটা বিয়ে করেন। আমার মায়ের আমিই

একমাত্র সন্তান। সৎ মায়ের সংসারে আমার আরও দুই ভাইবোন আছে। তাদের সাথে আমার মিলে না।

রুদ্রের কথা শুনে সেতুর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। সেতু বলে, আমার হৃদয়ে তোর যে শক্ত অবস্থান, সেখানে তুই ছাড়া আর কাউকে বসাতে পারব না।

আমার দিবারাত্র স্বপ্ন শুধু তোকে নিয়ে। তুই ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার। বাবা এখন আর আগের মতো নেই। অনেকটা বদলে গেছে। এতদিন তোর নামটা শুনতে পারত না। অথচ সেদিন কাছে ডেকে নিয়ে তোর কথা জিজ্ঞেস করল। জানতে চাইল তোর সাথে কোনো যোগাযোগ আছে কি না। বাবার এমন মহৎ আচরণে আমি হতবাক। আমার কাছে কোনো জবাব ছিল না। শুধু দুচোখে শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরল। বাবা বুঝে নিয়েছে তোর সাথে যোগাযোগ নেই। আজ তোকে পেয়ে হারাতে পারব না। তুই যদি এই ট্রেনে উঠে যাস, আমি জানি আমার জীবন থেকে সব আলো নিভে যাবে। তোর কাছে কিছু চাইতে আসিনি। শুধু বলতে এসেছি, আমার গায়ে আজও তোর ভালোবাসার গন্ধ লেগে আছে। আমি চাইলেও আমার হৃদয়ে যে রুদ্র শিকড় গেঁড়েছি তাকে ভুলতে পারব না।

সেতুর কথা শুনে রুদ্রের চোখেও মেঘ জমে। চারটি বছর রুদ্রও সেতুকে ভুলতে পারেনি। আয়নার প্রতিচ্ছবির মতো সেতুর মুখাকৃতি দিবারাত্র তার দৃষ্টিতে ছিল। রুদ্র বলে, আমি তোকে ভুলে যেতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। একটা মানুষ কিছু না বলে কীভাবে যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ভাবতেই বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত। জীবন থেকে চারটা বসন্ত হারিয়ে গেল, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এ শহরে আর থাকব না। কথা বলতে বলতে রুদ্রের কণ্ঠ ধরে আসে। বাহিরে বৃষ্টি থেমে গেছে। শীতল বাতাসে পচা মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রুদ্র বলে, তোর গায়ের গন্ধটা ভুলতেই আমি রাজশাহী যাচ্ছি। একটা নতুন শহর, নতুন কর্মস্থল, নতুন জীবন। কিন্তু তুই এসে আমার সব গুছানো নতুন স্বপ্নকে এলোমেলো করে দিলি।

তুই কী চাস সেতু?

প্রশ্ন করে রুদ্র সেতুর চোখে চোখ রাখে। সেতুও দৃষ্টি রাখে রুদ্রের চোখে। চার চোখের মহামিলনে তৈরি হয় অন্যরকম এক অনুভূতি। যে অনুভূতি চার বছরের জমে থাকা দুঃখকষ্টের মেঘ শীতল বৃষ্টি হয়ে ঝরে। সেতু ওড়নার আঁচলে চোখ মুছে বলে, আমি বলতে চাই, তুই আর একা না তোর পাশে আমিও আছি। কথা বলার মাঝে সেতু রুদ্রের হাত চেপে ধরে এবং বলে, তুই শুধু বল এই হাতের বন্ধন আর টুটবে না। আমি কথা দিলাম আমি আমৃত্যু তোর পাশে থাকব। অনাগত ঝড়তুফানে তুই আমার মাথার ছাতা। শুধু তোর বুকে আমার মাথা রাখার ঠাঁইটুকু আমাকে দে। কথা বলতে বলতে সেতু রুদ্রের বুকে মাথা গুঁজে নীরবে কাঁদকে থাকে।

লাইন ক্লিয়ারের ফ্ল্যাশিং আলো লাল হয়। রাজশাহী এক্সপ্রেসের হুইসেল বেজে ওঠে। চারপাশে সুনসান নীরবতা। রুদ্র চোখ বন্ধ করে সেতুর মাথা বুকে চেপে ধরে একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বলে, এই ভালোবাসার বুকটা আগেও তোর ছিল, আজও তোরই আছে। এই বুকে তুই ছাড়া আর কারো ঠাঁই নাই।

লাইনম্যানের সবুজ সংকেত পেয়ে ধীর লয়ে ট্রেনের চাকা ঘুরতে থাকে। রুদ্র বুক থেকে দুহাতে মাথা সরিয়ে সেতুর একটা হাত ধরে বলে, চল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, উঠে পড়ি।

রুদ্র সেতুকে নিয়ে ট্রেনের হেন্ডেল ধরে উঠতে যাবে এমন সময় একজন মাঝ বয়স্ক লোক সামনে হাত বাড়িয়ে বলেন, না, তোমরা এভাবে পালিয়ে যেতে পারো না। যারা কাপুরুষ তারাই পালিয়ে যায়। সাহসীরা কখনো পালায় না।

ওরা দু'জন ট্রেনে উঠতে পারে না। এক যুবক রুদ্রের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায়। রুদ্র ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই সেতু বলে উঠে, আব্বু তুমি?

—হ্যাঁ, আমি। তোরা ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবি। আমি তা হতে দেব না।

আচমকা সেতুর বাবার আগমনে রুদ্র বিস্মিত হয়। রুদ্র কখনো সেতুর বাবাকে দেখেনি। আজই প্রথম দেখল। কী ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। একটা অজানা ভয়ে দুজনের বুক ধড়ফড় করছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছে। এর মধ্যে সেতুর মা এসে সামনে দাঁড়ায়। সেতু বলে, মা তুমিও এখানে!

সেতুর মা বলেন, তুই পালিয়ে যাবি আর আমরা ঘরে বসে থাকব।

কথার মাঝে রুদ্রের বন্ধু সজল এসে পাশে দাঁড়ায়।

সেতু আর রুদ্রের বুঝতে বাকি থাকে না, ওদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার পেছনে সজলের হাত আছে। রাগে-দুখে রুদ্রের গা জ্বলতে থাকে। ইচ্ছে হয় সজলের গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে। যে যুবক ব্যাগ কেড়ে নিয়েছে সে আর কেউ নয়, সেতুর একমাত্র ছোটো ভাই রাকিব। রাকিব ওর বাবা-মাকে লক্ষ করে বলে, আব্বু-আম্মু তোমরা যাই বলো, আপুর পছন্দ আছে। দুলাভাই অনেক সুন্দর। চিত্র জগতের নায়কের মতো।

রাকিবের কথা শুনে সেতু আর রুদ্র কাঁদবে না হাসবে কিছুই বুঝতে পারে না। লাজে দুজনই মাথা নিচু করে ফেলে। পেছন থেকে সেতুর বাবা দুজনের কাঁধে হাত রেখে বলেন, ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমাদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছি। তোমরা বাসায় যাবে চলো। কথা বলতে বলতে সেতুর বাবা দুজনকে বুকে টেনে নেন। মা এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত রেখে বলেন, কাল সকালে কাজী ডেকে তোমাদের কাজটা সেড়ে ফেলব।

সজল বলে, দোস্ত আমাকে ভুল বুঝিস না। আমি শুধু চেষ্টা করেছি আঙ্কেল-আন্টিকে বুঝিয়ে তোদেরকে মিলিয়ে দিতে। আঙ্কেল-আন্টি আমার কথা রেখেছে। তোরা দুজনে একটু হাসতো দেখি।

মেঘের আড়ালে আরে চাঁদের হাসির মতো সেতু আর রুদ্রের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সেতুর বাবা-মা সমস্বরে বলেন, আর দেরি নয়, এবার চলো।

রাকিব রুদ্রের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সামনে এগোয়। সাথে বাবা-মা ও সজল। রুদ্র সেতুর হাতের আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে ধীর পায়ে এক্সিট গেটের দিকে অগ্রসর হয়। সমান্তরাল রেল লাইনের বুক বিদীর্ণ করে রাতের শেষ ট্রেন রাজশাহী এক্সপ্রেস ছুটে চলে তার গন্তব্যে।

চলে গেলেন সংগীতশিল্পী ডালিয়া নওশীন

নাজমুন নাহার

বাংলাদেশের বরেণ্য নজরুলসংগীত শিল্পী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ডালিয়া নওশীন আর নেই। ১লা এপ্রিল রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর প্রয়াণে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন এই গুণী শিল্পী। গত ২৭শে মার্চ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ১৪ বছরের কিশোরী। এপ্রিল মাসে তিনি পরিবারের সঙ্গে কলকাতা চলে যান এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থায় যোগ দেন। তাঁদের দল প্রথমে 'রূপান্তরের গান' নামে একটি গীতিনাট্য গায়। পরে সেই গীতিনাট্যের নাম পরিবর্তন করে 'মুক্তির গান' নাম দেওয়া হয়। তাঁর গাওয়া উদ্দীপনামূলক গানগুলো সে সময় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছে এবং মুক্তিকামী মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। সংগীতে তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা এবং অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালে তাঁকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করে।

নজরুলসংগীতের শুদ্ধ চর্চা ও প্রসারে ডালিয়া নওশীনের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সংগীত পরিবেশন করার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন তিনি। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'বিশেষ গ্রেডের' শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত ডালিয়া নওশীন দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেছেন।

ডালিয়া নওশীনের মৃত্যুতে কেবল একজন প্রতিভাবান শিল্পীকেই নয়, বরং বাংলাদেশ এক মহান দেশপ্রেমিক ও সাংস্কৃতিক অভিভাবক হারালো। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। বিদায়বেলায় এই গুণী শিল্পীর সুর ও সাহসিকতার স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে চিরকাল অমলিন থাকবে। গুলশান সোসাইটি মসজিদে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদায় বনানী কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জননী ছিলেন, তারা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনে বসবাস করছেন। ডালিয়া নওশীন ছিলেন প্রখ্যাত স্থপতি মাজহারুল ইসলামের সুযোগ্য কন্যা।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

হাম (Measles): আপনার যা জানা প্রয়োজন

হাম একটি খুব সহজে ছড়ানো ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত শিশুদের বেশি হয়। যেসব শিশু টিকা নেয়নি বা সম্পূর্ণ টিকা পায়নি, তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। হামের থেকে সুরক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ২ ডোজ সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণ করা।

হামের লক্ষণ ও উপসর্গ:

- সারা শরীরে র‍্যাশ: প্রথমে মুখে শুরু হয়, পরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫-৬ দিন থাকে।
- উচ্চ জ্বর
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- কাশি
- চোখ লাল হওয়া ও পানি পড়া
- মুখের ভিতরে ছোট সাদা দাগ

আপনার শিশুকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন:

- ৯ মাস ও ১৫ মাসে দেওয়া এমআর (হাম-রুবেলা) টিকার ২ ডোজ সম্পূর্ণ করুন।
- নিয়মিত সব টিকা সময়মতো দিন
- আসন্ন এমআর টিকাদান ক্যাম্পেইনে অংশ নিন
- সন্দেহভাজন (জ্বর ও র‍্যাশ থাকা) রোগীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিন

কারও হাম হলে কী করবেন:

- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিন
- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন
- শিশুকে আলাদা রাখুন (স্কুল, ভিড় বা খেলার জায়গায় যাওয়া বন্ধ রাখুন)

কোথায় সাহায্য বা তথ্য পাবেন:

- নিকটস্থ সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র
- স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী (হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট)

©World Health Organization Bangladesh

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 11, May 2026, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd